কন্যার প্রতি উপদেশ।

(বঙ্গ-মহিলাদিগের গার্হস্থ্য-জীবনের উপযোগী প্রবন্ধাবলী)

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

১৩৩৪ সাল।

কলিকাতা

১৮ নং বৃন্দাবন বসাকের ষ্ট্রীট

ওরিএণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত।

৩৮ নং মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট

— হইতে —

শ্রীকৃষ্ণানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

উৎসর্গ পত্র।

পরমারাধ্য

স্বর্গীয়

পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর

পবিত্র

চরণোদ্দেশে

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা

অশেষ ভক্তিসহকারে

উৎসর্গীকৃতা

হইল।

ইতি।

সূচীপত্র ।

ভূমিকা।

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের উন্নতিকল্পে যে সকল বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তার যোগ্য তন্মধ্যে নারী-শিক্ষা অন্যতম। নারীর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক জীবনের উন্নতির উপর অন্য সকল প্রকার উন্নতি সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে। নারীর বুদ্ধিবৃত্তি, বিদ্যা, বিচক্ষণতা, দৈহিক-শক্তি-সামর্থ্য, কর্ম্মকুশলতা প্রভৃতি লইয়াই বর্ত্তমানকালের হিন্দু সমাজের উত্থান-প্রয়াস। আমাদের ভাবী বংশধরদিগের শরীর-মন-গঠন, কার্য্যদক্ষতা, জীবন-যুদ্ধের জয়-পরাজয়—সমস্তই বর্ত্তমান বালিকা-সমাজের হাতে। তাই আজ দেশব্যাপী সুসংস্কৃতভাবে নারী-শিক্ষা-প্রবর্ত্তন-চেষ্টা ও আন্দোলন। নারী সুশিক্ষিতা না হইলে ব্যক্তিগত তথা সমাজগত সুখ স্বচ্ছন্দতা ও জাতীয় উন্নতি কোন প্রকারে রক্ষা করা যায় না। ইহা বুঝিয়াই বর্ত্তমান জাতীয়-নেতারা নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনপূর্ব্বক বালিকাদিগকে যুগোপযোগী ভাবে শিক্ষা দীক্ষা দিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

যে প্রকারে হিন্দু-দুহিতা মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণের প্রদর্শিত পথে নিজ পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত রীতিনীতি—পদ্ধতি বজায় রাখিয়া, নিজ স্বামী, পুত্র, শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ননদ, পিতামাতা, ভাই, ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের ও স্বদেশের নিকট শুভদায়িনী ও প্রিয়কারিণী হইয়া নিজ সংসারকে সুখের আগারে পরিণত করতঃ নিজে সুখ-সম্পদের অধিকারিণী হইতে পারে, সেই মহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া "কন্যাকে" উপদেশ দেওয়ার ছলে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিত হইয়াছে। ইহাতে তাহার মনে ধর্ম্মভাবের

উন্মেষ করিয়া নিজ আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিসাধন করিবে; —ইহাতে তাহার মনে ভগবানে ভক্তি আনয়নপূর্ব্বক দুঃখে শোকে সহিষ্ণুতা ও সান্ত্বনা প্রদান করিবে,—ইহাতে সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি পৌরাণিক রমণীগণের আদর্শ গ্রহণে সহায়তা করিয়া সেইভাবে অনুপ্রাণিতা করিবে—ইহাতে নবযুগের উপযোগী সুসংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে আপনাকে শিক্ষিতা, কার্য্যদক্ষা ও সংসারে সর্ব্ব বিষয়ে উপযুক্তা করিবে;—যাহাতে সে পরে নিজ গার্হস্থ্য-জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে যাপন করিতে সক্ষম হইবে। সংক্ষেপতঃ পরবর্ত্তী জীবনে সুগৃহিনী হইতে হইলে যে সমস্ত গুণ থাকার নিতান্ত দরকার তাহা বালিকারা এই পুস্তক পাঠে কথঞ্চিৎ শিখিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়। এই পুস্তিকা দ্বারা হিন্দু বালিকাগণ যদি কিঞ্চিৎ উপকার প্রাপ্ত হয় এবং দেশমধ্যে নানাস্থানে যে সমস্ত নারী-মঙ্গল-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে তাহাতে এই পুস্তিকা যদি কিঞ্চিৎ সাহায্যকরীস্বরূপ বিবেচিত হয় তবেই আমি ধন্য হইব এবং শ্রম-সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ মাতৃ-মন্দির নামক মহিলা-কল্যাণকরী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক মহোদয় এবং তথাকার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী নামক উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার প্রধান পণ্ডিত মহাশয় এবং অন্য কয়েকজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি দেখিয়া প্রশংসা করতঃ মুদ্রন বিষয়ে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। ইতি—১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩৪ সাল।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৮ নং মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট,
কলিকাতা।

উন্মেষ করিয়া ি

কন্যার প্রতি উপদেশ।

—ইহাতে তাহার ম

সহিষ্ণুতা ও সান্ত্বনা দুঃকেও দিতে পারে না। আবার দুঃখও স্থায়ী

দ্রৌপদী, দময়ন্তী প্রভৃতি ে পারে না। সুখ দুঃখ নিজ নিজ মনের

সহায়তা করিয়া সেইভাবে অনুপ্রগড়িয়া লইয়া ভোগ করিতে হয়।

উপযোগী সুসংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালীকিল না, সুতরাং দুঃখ দূর করিয়া

কার্য্যদক্ষা ও সংসারে সর্ব্ব বিষয়ের মনকে সেইভাবে প্রস্তুত করিয়া

সে পরে নিজ গার্হস্থ্য-জীবন সুখে স্ব

হইবে। সংক্ষেপতঃ পরবর্ত্তী জীবনে সুধর্ম্ম, যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়া-

সমস্ত গুণ থাকার নিতান্ত দরকার তাহা ত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন,—

কথঞ্চিৎ শিখিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাধ্যাহ্নে শাক অন্নও আহার করে

দ্বারা হিন্দু বালিকাগণ যদি কিঞ্চিৎ উ সর্ব্বপ্রকার আত্মবশ অবস্থাই

দেশমধ্যে নানাস্থানে যে সমস্ত নারী-ম। যেমন নাকি অনেকে নির্জ্জনে

এবং হইতেছে তাহাতে এই পুস্তিকরিয়া থাকেন অথচ তাঁহার নিকট

বিবেচিত হয় তবেই আমি ধার তরেও ভয়ানক অসহনীয় হয়। আবার

কলিকাতার প্রসিতজন্য ক্রমাগত ২।৩ দিন উপবাসী থাকেন অথচ

মাসিক পত্রিকার ।ধ্য হইয়া একদিনের তরে উপবাসী থাকিতে হইলে

সেমিনারী নাহ করিতে পারেন না। তাৎপর্য্য এই, নিজ কৃতকার্য্য

পণ্ডিত মহাঃখে মনের শান্তি নষ্ট হয় না তাই কষ্টকে কষ্ট বলিয়া

পাণ্ডুলিপি হয় না; অথচ সেই পরিমাণ কষ্ট অন্যকৃত হইলে দুঃসহ হয়

করিয়াছে তু সুখ দুঃখ নিজের মনে।

তুমি যদি নিয়ত তোমার চেয়ে ভাল অবস্থাপন্ন লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখ, তাদের ভাল অবস্থার সঙ্গে নিজের মন্দ অবস্থার তুলনা করিতে থাক, তবে তোমার মনে হইবে তোমার মত দুঃখী জগতে নাই। আবার তোমার চেয়ে মন্দ অবস্থার লোকের সঙ্গে তোমার অবস্থার তুলনা করিতে থাকিলে নিজেকে কত সুখী বোধ করিবে।

তখন বলিবে ভগবান্ তোমাকে উহাদের মত না করিয়া এইরূপ অবস্থায় রাখিয়াছেন ইহাতে তুমি তাঁহার কাছে কতই কৃতজ্ঞ। আবার দেখ ভাল অবস্থাপন্ন লোকের কথা ভাবিতে ভাবিতে পরিশেষে ক্রমে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাল অবস্থা যাঁহার সেই রাজারাণীর কথা মনে পড়ে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে রাজারাণীর মত অসুখী জগতে আর দ্বিতীয় নাই। তাঁহাদের মনে সর্ব্বদা প্রাণভয়, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অশান্তি। এই সে বছর ইউরোপের মহাযুদ্ধের সময় কত রাজারাণী ঘাতকের হাতে প্রাণ হারালেন— পুত্রকন্যা সকলেই। আবার কত রাজারাণী প্রাণভয়ে ছদ্মবেশে দেশে দেশে পলাইয়া বেড়াইয়াছিলেন। সুতরাং তাদের মত দুঃখের অবস্থা কয়জন পাইতে চায়? এইরূপ যত বেশী বড়লোক তত বেশী অসুখী।

ঐ যে বড়লোকের গৃহিণী এক গা হীরা মতির গয়না প'রে বহু-মূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে দাসী সঙ্গে নিয়ে মটরগাড়ী চড়ে হাওয়া-খেতে বেরুলেন, উহাকে দেখে তোমার মনে হয়ত এরূপ বোধ হইল যে তুমি বড় দুঃখী, যেহেতু তুমি ঐরূপ ভাবে বেড়াতে যেতে পারলে না। কিন্তু সেটি তোমার বিষম ভুল। তুমি নিশ্চয় উহার ঘরের কথা জান না; কিন্তু আমি জানি। ঐ স্ত্রীলোকটীর স্বামী একজন ধনী বটে কিন্তু বড় মাতাল ও দুশ্চরিত্র। সে কোনদিন রাত্রে বাড়ীতেই থাকে না। সকাল বেলা বাড়ী আসিয়া অকারণে স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করে গালি দেয় এমন কি মারিয়া থাকে, সেজন্য তাহার স্ত্রী অনেকবার আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল। সুতরাং বহুমূল্য বসন ভূষণ মটর গাড়ীতে ঐ হতভাগিনীর মনে বিন্দুমাত্র সুখ দিতে পারে না। তার চেয়ে ঐ যে আধাবয়সী মাগী অন্ধ স্বামীর

হাত ধরিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়া থাকে সেও হাজার গুণে বেশী সুখী। যেহেতু ঐ মেয়ে মানুষটীর একটু ভাল চেহারা এবং বয়স কিছু কম দেখিয়া কোন কোন দুশ্চরিত্র লোক ওকে নিয়ে ঘরকন্না করিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ও কিছুতেই রাজী হয়নি। এতেই বোঝা যায় সে ঐ অন্ধকে নিয়ে ভিক্ষা করে খেয়ে বেশ সুখে আছে। এই দুইটী বিষয় আমার স্বচক্ষে দেখা, তাই তুমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পার। অতএব দেখ, সুখ অবস্থাতে নহে—সুখ মনে। যে বুদ্ধিমান্ যত বেশী সুখ মনে গড়ে নিয়ে ভোগ করিতে পারে সে তত বেশী সুখী হতে পারে। সুখের মূল হচ্ছে সন্তোষ। তুমি নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিলে তুমি রাজরাণী; আবার সত্য সত্য রাণী হইয়াও মনে অসন্তুষ্ট থাকিলে তুমি চির-দুঃখিনী হতভাগিণী ভিন্ন নহে। তুমি সর্ব্বদা এই কথাটী মনে রাখিবে যে ভগবান্ তোমাকে তোমার উপযুক্ত এবং সুখের অবস্থাতেই স্থাপিত করেছেন তবে তুমি যা কিছু দুঃখ কষ্ট পাও সে কেবল তোমারই নিজের দোষে।

আপন চক্ষুর দৃষ্টির উপর সব সময় বিশ্বাস করা উচিত নহে। বাতাস দেখিতে পাই না, তাই বলে কি সিদ্ধান্ত করিব যে বাতাস বলে কোন পদার্থ নাই? আবার স্বচক্ষে দেখিলেও অনেক সময় তাহা মিথ্যা। বড় আর্শির সম্মুখে দাঁড়ায়ে দেখিবে ঠিক তোমার মত একজন সুমুখে দাঁড়ায়ে রয়েছে কিন্তু হাত দিয়ে ছুঁইতে গেলেই দেয়ালে হাত ঠেকিবে। ছাতের উপর থেকে দেখ দূরে একটা বালক আসিতেছে। তারপর সে নিকটে আসিলে তুমি বলিবে "ওমা এযে আধবয়সী মিন্‌সে।" চলন্ত রেলগাড়ীতে বসে দেখতে পাও দূরের গাছগুলি যেন দৌড়াচ্ছে। আবার ষ্টেসনে দুইখানি

পাশাপাশি দাঁড়ানো গাড়ীর মধ্যে একখানি ছাড়িলে বোধ হয় যেন অন্য গাড়ীখানি চলিতেছে আর প্রকৃত চলন্ত গাড়ীখানি যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আবার দেখ পৃথিবী নিয়ত সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে কিন্তু দৃঢ় প্রত্যয় হয় যেন সূর্য্যই ঘুরিতেছে। এই সকল ভুল দেখার নাম দৃষ্টি বিভ্রম অর্থাৎ মিথ্যাকে সত্য বলিয়া এবং সত্যকে মিথ্যা বলিয়া ধারণা করা। যেমন নাকি কোন নূতন যায়গায় গেলে অনেক সময় দিক্‌ভ্রম হইয়া থাকে, তখন সূর্য্যকে উদয় হইতে দেখিলেও বোধ হয় যেন সূর্য্য উত্তর কি দক্ষিণ দিক্‌ হইতে উঠিতেছেন এবং আমার যে ধাঁধা লাগিয়াছে তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। সেইরূপ বড়লোকের বাড়ীর সুখ দূর থেকে বেশ মনোরম চাক্‌চিক্যময় বলিয়া বোধ হয় কিন্তু নিকটে গিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সব ফাঁকা।

আমাদের আসক্তি হচ্ছে দুঃখ কষ্টের মূল কারণ। পুত্র কন্যা ধনৈশ্বর্য্য, বাড়ী ঘর, বিষয় সম্পত্তি যে জিনিসে আমাদের যত বেশী আসক্তি হইবে তাহা হইতেই আমরা তত বেশী কষ্ট পাই। ঐগুলি আমাদের মনকে এত অভিভূত করে রাখে যে উহাদের বিচ্ছেদ আমরা কল্পনাতেও সহ্য করিতে পারি না অথচ স্বভাবের নিয়ম অনুসারে আজ হউক কাল হউক উহাদের বিলয় হইবেই। রেল-গাড়ীতে বসিয়া অনেক সময় অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় বন্ধুত্ব হয়ে থাকে। শেষে সেই লোকটী নিজের গন্তব্য ষ্টেসনে নামিয়া গেলে মনে বেশ একটু কষ্ট বোধ হয়ে থাকে কিন্তু সে কষ্ট ক্ষণিক। শীঘ্রই আবার মনে বুঝিয়া কষ্ট দূর করা যায়। এক্ষণে পুত্র কন্যা আত্মীয়স্বজনকে যদি রেলগাড়ীর সহযাত্রীর ন্যায় অল্প সময়ের পরিচয় বলিয়া বুঝিতে পারা যায় তবে শোকের আগুনে মনকে পোড়াইতে

পারে না। অর্থ বিত্ত, বিষয় সম্পত্তি কিছুই চিরস্থায়ী নহে ভাবিয়া উহাদের উপর বেশী আসক্তি করিলেই ঠকিতে হইবে।

দুঃখ কষ্ট দূর করিতে হইলে প্রভূত মনের বলের দরকার। ইহাতে তোমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট, ভয় শঙ্কা, আপদ বিপদ, রোগ শোক, জ্বালা যন্ত্রণা দূর হবে এবং অগ্নি পরীক্ষায় সীতাদেবীর মত অক্ষত দেহে অটুট শরীরে, প্রফুল্ল চিত্তে বিপদের আগুন হইতে বাহির হইতে পারিবে। এই সে বছর অসহযোগ আন্দোলনের হুজুগ উঠিলে কত হাজার বালক স্কুল কালেজ ছাড়িয়া হাসিতে হাসিতে জেলে গিয়া কত কষ্টই না সহ্য করেছিল! কিন্তু তারা কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য করে নাই, যেহেতু তাদের মনে প্রভূত বল ছিল, যার তুলনায় ঐ সমস্ত শারীরিক কষ্ট অতি তুচ্ছ জ্ঞান করেছিল।

আবার আর একরকম দুঃখ কষ্ট দৈব দুর্বিপাক বশতঃ হয়ে থাকে। যেমন নাকি ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারী, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, অরাজকতা ইত্যাদি যাহা দেশজুড়ে হয়ে থাকে, যাহা মানুষে নিবারণ করিতে পারে না। তবে তার জন্য দুঃখ করা কেন? কেবল নিজের অশান্তি টানিয়া আনা। তুমি এই ভাবিয়া মনকে শান্ত করিবে যে, যে কষ্ট দেশ শুদ্ধ লোকে ভোগ করিতেছে তাহা তুমি অবশ্যই সহ্য করিতে পারিবে।

অজ্ঞানতাই হচ্ছে সমস্ত প্রকার দুঃখের মূল কারণ। যথার্থ জ্ঞান না থাকাতে আমরা সার বস্তুকে অসার এবং অসারকে সার বস্তু ভাবিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া নিয়ত দুঃখ পাইতেছি। এই অজ্ঞানতাই হচ্ছে মোহ যাহা যথার্থ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই অজ্ঞানতা হেতু পতঙ্গ দীপশিখাকে সুখকর মনে করিয়া তাহাতে

লাফাইয়া পড়ে। আবার নির্ব্বোধ শিশু সুন্দর খেলার জিনিস মনে করিয়া বিষাক্ত সর্প ধরিতে যায়। আমরাও সেই মোহ বশতঃ অনিত্য সংসারকে সার জ্ঞান করিয়া নিত্য ও চির সুখকর যে ভগবান্ তাঁহাকে ভুলিয়া অহরহঃ দুঃখ ভোগ করিতেছি। এ সম্বন্ধে পরে আরো বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিবার ইচ্ছা রহিল।

যখন দুঃখ কষ্টে অভিভূত হইয়া পড়িবে, যখন যন্ত্রণা একেবারেই অসহনীয় বোধ হইবে তখন মনে মনে এই সান্ত্বনা নেবে যে যখন সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, শৈব্যা, দময়ন্তী, চিন্তা প্রভৃতি রাজার মেয়ে রাজ-বধূরা এত পুণ্যশীলা হইয়াও আজীবন দুঃখ ভোগ করিয়াছেন তখন সাধারণ স্ত্রীলোকের ভাগ্যে কতদূর দুঃখ কষ্ট আসিতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিবে। অতএব সর্ব্বদা দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেই আমাদের সংসারে থাকা এই কথাই ভাবিবে। "সুখ সুখ" করে হা হুতাশ করিলে সুখ পালায় এবং দুঃখই আসে। কিন্তু সুখ চাইনা দুঃখ আসে ক্ষতি নাই এই কথা ভাবিলে সুখ আসে। কুন্তীদেবী বলিতেন "হে কৃষ্ণ! তুমি আমাকে দুঃখই দিও, কারণ তাহলে সর্ব্বদা তোমার নাম আমার মনে থাকিবে আর সুখ পাইলে আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব।"

স্বার্থপরতা।

স্বার্থপরতা যুক্তপরিবারের কণ্টক স্বরূপ। যেমন সুন্দর একটী ফুলের বাগানে কতকগুলি কাঁটাগাছ জন্মিলে, ফুলগাছগুলি মরিয়া গিয়া বাগানের পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায়, সেইরূপ যে পরিবারে একজন স্বার্থপর লোক থাকে তথাকার সুখশান্তি একেবারেই লোপ পায়। গীতাগ্রন্থে ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন "ত্যাগ ভিন্ন সুখ নাই"। তুমি যদি নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা, আরাম, সুবিধা ত্যাগ করে অন্য পাঁচজনকে সুখী করিতে না পারিলে তবে তোমার মহত্ব কোথায়? তোমার মনুষ্যত্ব কি নারীত্ব একেবারেই বৃথা হইল। আহার নিদ্রা সন্তান পালন মনুষ্যে করিয়া থাকে আবার পশু পক্ষীতেও করে থাকে কিন্তু পশু পক্ষীরা নিজ নিজ স্বার্থের গণ্ডীর বাহিরে কিছুই করে না। একারণ ইতর জন্তু হইতে নিজকে পৃথক রাখিতে হইলে অর্থাৎ মানব নাম সার্থক করিতে গেলে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়; নতুবা তুমি কোন ক্রমেই পশু পক্ষী হইতে উচ্চপদবীযুক্ত বলিয়া গৌরব করিতে পার না।

যে পরিবার মধ্যে যে ব্যক্তি অন্য সকলকে সুখী করিয়া নিজে সুখী হইতে না শিখিয়াছেন তিনি কোন কালে প্রকৃত সুখের আস্বাদ পান নাই। যিনি সর্ব্বদা মনে করেন আমি সকলের বিনা বেতনের চাকর, তিনিই সেই পরিবারের যথার্থ কর্ত্তা কিম্বা কর্ত্রী; আর সকলে তাঁহার পদানত ভৃত্য। যদি তুমি নিজে সর্ব্বদা ভাল খেতে ভাল পরতে, এবং নিজ সন্তানগণকে ভাল খাওয়াতে ভাল পরাতে ইচ্ছা কর; নিজে আরামে থাকিয়া শ্রমসাধ্য কাজগুলি অপরের

ঘাড়ে চাপাও; নিজের স্বামী উপার্জ্জন করিয়া সাধারণের সংসার চালাইতেছেন, এই গর্ব্ব, বাক্যে এবং ইঙ্গিতে প্রকাশ কর, তবে সকলেই তোমার উপর মনে মনে চটিবে এবং ক্রমে ক্রমে তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। আর ইহার জন্যই যুক্ত পরিবার ভাঙিয়া যাবে। সুতরাং তোমার সুখ শান্তির আশ্রয় স্থান নষ্ট হইয়া যাবে।

যদি ভাব, পৃথক হইলে তোমার স্বামীর উপার্জ্জনে তোমার ছোট সংসার রাজার হালে চলে যাবে সুতরাং অবিলম্বে পৃথক্ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। বস্তুতঃ সেটি তোমার সুবুদ্ধি নহে নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি। তুমি কি ভাবিয়া দেখিতেছনা, ঈশ্বর না করেন তোমার স্বামীর কোন বিপদ ঘটে তখন তুমি তোমার অপগণ্ড শিশুগুলিকে লইয়া কাহার আশ্রয়ে যাইবে? তোমার স্বামী যেমন টাকা দ্বারা যুক্ত পরিবারের সাহায্য করিতেছেন অন্য পাঁচজনে সেইরূপ কায়িক পরিশ্রম দ্বারা সংসার বজায় রাখিতেছে, যাদের অভাবে তোমার সংসার একদিনও চলে না। তোমার সন্তানদের পীড়ার সময় কাহারা ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়া, ঔষধ পথ্য দিয়া, রাত্রি জাগিয়া রোগীদিগকে সুস্থ করে তোলে? সুতরাং ঐ সব পোষ্যদিগকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা তোমার বুদ্ধিমানের কাজ। স্বার্থত্যাগ দূরে থাকুক, ইহাতেই তোমার স্বার্থ রক্ষা হইবে।

তুমি দেওর, ননদ, ভাসুর, যা ও তাদের সন্তানদের থাওয়াইয়া পরাইয়া নিজের সন্তানদের ভার তাদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিয়া দেখিবে তাহারা তোমারই সন্তানদিগকে আদর যত্ন করিয়া শেষে নিজেদের ছেলে মেয়েদের কথা ভাবিবে। এইরূপে তোমার ষোল আনা দাবী ও প্রাধান্য বজায় থাকিবে অথচ কেহই অসন্তুষ্ট হইবে না। নিজের হাতে লওয়া চেয়ে পরের হাতে লওয়া বুদ্ধিমানের

কাজ, বিশেষতঃ তোমার স্বামীর উপার্জ্জনে যদি ঐ সংসার চলিয়া আসিতে থাকে। নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা, আরাম বিরাম প্রভৃতি সর্ব্ববিধ স্বার্থত্যাগ ক'রে পরকে সুখী করিলে, পরিণামে উহা যে নিজেরই সুখের হেতু হইয়া থাকে, এ কথা চিরকাল জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলিয়া আসিতেছেন সুতরাং আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানবের পক্ষে সেই উপদেশ মানিয়া চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু এই জগতে কখনো কখনো ইহার বিপরীত ঘটনা দেখা যায় অর্থাৎ ভাল করিলে প্রতিদানে মন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু সেজন্য আমাদের বিচলিত হওয়া উচিত নহে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় লোকের ভাল করিয়া মন্দ পাইলেও চিরকাল লোকের ভালই করিয়া গিয়াছেন।

আশা।

এ সংসারে থাকিয়া আশা না করাই সব চেয়ে ভাল। তবে যদি একান্তই আশা করিতে হয় ত ছোট ছোট রকমের দুএকটী। আমি এই বুড়া বয়সে অনেক দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞান পাইয়াছি যে, এই পৃথিবীতে আশা করিলেই নৈরাশ্য ভোগ করিতে হয়। এক শতটী আশার মধ্যে ৯৫টী নিষ্ফল যায়; বাকী পাঁচটীও ষোল আনা পূর্ণ হয় না। সুতরাং একেবারেই আশা না করাই সব চেয়ে ভাল; কারণ তাহলে আশা ভঙ্গ জনিত মর্ম্মবেদনা ভোগ করিতে হয় না। এই নৈরাশ্য জনিত দুঃখ একেবারেই নিজের মনগড়া দুঃখ।

কোথায় কিছুই অভাব নাই, কোন প্রকারে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যাইতেছে এমন সময় একদিন হঠাৎ তোমার মনে উদয় হইল আর এক বছর পরে তোমার অমুকের এত টাকা বেতন বৃদ্ধি হইবে অথবা আমার অমুক আত্মীয় নিঃসন্তান হেতু মৃত্যুকালে আমাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী করিয়া যাইবেন অথবা আমি লটারীর যে টিকেট কিনিয়াছি উহাতে প্রচুর টাকা পাওয়া যাইবে—ইত্যাদি রকমের নানা প্রকার অসম্ভব আশা তোমার মনে উদয় হইল, আর অমনি তুমি দিন গণিতে লাগিলে ও মনে মনে নানা রকম আকাশ কুসুম তৈয়ারি করিতে লাগিলে:—কখনো নূতন নূতন গয়নার ফর্দ্দ, কখনো বাটী প্রস্তুত, কখনো দাসদাসীর সংখ্যাবৃদ্ধি কল্পনা করিয়া আপাততঃ মনে তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিলে বটে কিন্তু এই রূপে যত দিন যাইতে

লাগিল ততই এই লুব্ধ আশা মনের মধ্যে শিকড় নামাইতে লাগিল। ক্রমে উহা পল্লবিত ও মুকুলিত হইয়া কুসুমিত পর্য্যন্তও হইয়া উঠিল কিন্তু হায় ঐ পর্য্যন্ত শেষ হইল, উহা কখনই ফলিত হইয়া উঠিল না। তখন হা হুতাশ করিয়া অন্নজল ত্যাগ দ্বারা শরীর জীর্ণ শীর্ণ করত এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কেন বাপু, তোমার এ অসম্ভব আশা করা কেন? আবার হা হুতাশ করাই বা কেন? তোমার পান্থা ভাত বাতাস দিয়া খাও আর সুখে নিদ্রা যাও। তোমার এ রাতারাতি বড়মানুষ হওয়ায় দুরাশা করা কেন? "ভগবান্ সদয় হয়ে যা দেবেন তাই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া সুখী হইব"—এই কথা ভাবিয়া তাঁহার দয়ার উপর বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত হয়ে থাক না কেন?

তাই বলিতেছি, আশা করিতে নাই। উহাতে দুঃখ কষ্ট এত বেশী যে কদাচিৎ এক দুইটী আশা পূর্ণ হইলেও নিষ্ফল গুলির মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার কিছুতেই প্রতিবিধান হয় না। জগতে যেমন ভাল হইবে বলিয়া আশা করিলেই ঠকিতে হয় তেমনি আবার "মন্দ হইবে মন্দ হইবে" ভাবিয়া নিয়ত আশঙ্কা উৎকণ্ঠায় শরীর ক্ষয় করাও মুর্খতা। এমতাবস্থায় সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে প্রশান্ত চিত্তে সুসময়ের প্রতীক্ষা করা; যেহেতু মানুষের ভাল মন্দ সব তাঁহার হাতে। তিনি ভিন্ন কেউ কারু ভালমন্দ করিতে পারে না। তবে কি জন্য কল্পনায় গড়িয়া মিছামিছি এই অশান্তি ভোগ করি? আমি সর্ব্বদাই এই ভাবি না কেন, "আমি তার একান্ত নির্ভরশীল ভক্ত এবং তিনি কখনই ভক্তের ভাল বই মন্দ করিতে পারেন না। তিনি আমার যথার্থ মঙ্গল উপযুক্ত সময়ে অবশ্যই দেবেন, চাহিতে হবে না।

উপরে আশার কেবল দোষের উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু ভগবানের সৃষ্টিতে কিছুই একেবারে দোষযুক্ত নহে। আশারও একটু উপকারিতা আছে। কত দীন দুঃখী ভবিষ্যতে ভাল হবে এই আশায় বুক বাঁধিয়া বর্ত্তমানের অসহ্য দুঃখ কষ্ট সহিতেছে। ভবিষ্যতে ভাল হওয়ার আশা তাদের মনে না থাকিলে হয়ত তারা মরিয়া যাইত। আবার বিদেশস্থ পুত্রের বহু দিন যাবৎ সংবাদ না পেয়ে বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতামাতা পাগলের মত হয়েছে। তাহারা কেবল আশায় বুক বাঁধিয়া কোনরূপে দিন কাটাইতেছে। তাহারা প্রতিদিন ভাবিতেছে আজ নিশ্চয় তাহাদের জীবনধন পুত্রের সুসংবাদ আসিবে; কিন্তু সংবাদ ত আসিল না। এইরূপে কত দিন কাটিল। বুড়া মা বাপ তবু সন্তানের আশায় জীবিত রহিয়াছে। কিন্তু হায়! তাহারা জানে না কত দিন আগে সেই প্রাণাধিক প্রিয়তম সন্তান পরলোকের অতিথি হয়েছে সুতরাং সে আর বাড়ী আসিবে না তবু মা বাপ তারই দর্শন আশায় আজও জীবিত রয়েছে।

নিন্দা ও সুখ্যাতি।

একটা প্রবাদ আছে, "কন্যা ও কথা প্রদান কালে অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া দিতে হয়।" ইহার অর্থ হচ্ছে,—যেমন বিবাহের সময় মেয়েকে অলঙ্কার পরাইয়া সম্প্রদান করিতে হয়, তেমনি আবার কাহারো কথা অন্য কাহাকে বলিবার সমর পাঁচরকম অলঙ্কার দিয়া বক্তার মনোমত করিয়া সাজাইয়া বাড়াইয়া বলা মানুষের স্বভাব। অতএব কেহ তোমায় নিন্দা করিয়াছে শুনিলে তুমি একেবারেই নিজের মনের স্থিরতা ধীরতা নষ্ট করিয়া চটিয়া লাল হইবে না। তোমায় তখন চিন্তা করে দেখা উচিত, সত্যই তোমার সে দোষ আছে কিনা. অথবা যার মুখে শুনেছে সে নিজের ইচ্ছামত বাড়াইয়া পাঁচটী অলঙ্কার দিয়া তোমায় শোনাইয়াছে কিনা। এই সমস্ত বিচার করে দেখে যদি যথার্থই তুমি নিন্দার যোগ্য হয়ে থাক, তবে তোমার রাগের কারণ কি? বরং তোমার ঐ দোষ সংশোধন করিয়া লইয়া দোষশূন্য হওয়ার সুযোগ পাইলে ভাবিয়া সন্তুষ্ট হওয়াই কর্ত্তব্য। নিন্দা শুনিলেই প্রথমে না চটিয়া ধীরভাবে নিজমন পরীক্ষা ক'রে তবে আবশ্যক হইলে মৃদুভাবে প্রতিবাদ করা অথবা নীরব থাকাই সঙ্গত কিন্তু কোন ক্রমেই ঝগড়া করা উচিত নহে। তাহলে তুমি "ঝগড়াটে" কি "মুখরা" এইরূপ নূতন একটা নিন্দনীয় আখ্যা প্রাপ্ত হইবে।

মানুষ দোষশূন্য নহে। অতিবড় জ্ঞানী মুনি ঋষিদেরও ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে। কিন্তু দোষ দেখাইলে তাঁরা সন্তুষ্ট হন, রাগ কখনই করেন না। দোষ দেখাইলে রাগ করিতে নাই। তবে

ভবিষ্যতে আর কেহ কোন দোষ ধরিতে না পারে সে পক্ষে সতর্ক থাকিতে হয়। যদি আহারে বসিয়া কেউ বলেন "তুমি এত বিশ্রী রাঁধিয়াছ যে তাহা মুখে দেওয়া যায় না," অমনি তুমি হাতা লইয়া তাঁহাকে মারিতে না গিয়া চুপ করে থাকিবে অথবা মৃদুভাবে বলিবে,—"হাঁ আমি দ্রৌপদীর মত রাঁধিব কিরূপে? তবে সাধ্যমত চেষ্টা করে থাকি এবং ভবিষ্যতে চেষ্টা করিব ইত্যাদি ইত্যাদি।"

লেখকের আত্মকথা,—আমার তৃতীয়াকন্যা কমলার জন্য যে খাতা লিখিয়াছিলাম এই বর্ত্তমান পুস্তিকা তাহারই নকল সুতরাং এই প্রবন্ধ ও পরবর্ত্তী অনেকস্থলে অনেক কথা আমার কন্যা কমলা অমলার প্রতি সুপ্রযোজ্য হইতে পারে কিন্তু বধূমাতাদের প্রতি ঠিক খাটে না তথাচ ঐ সকল অংশ বাদ দিয়া প্রবন্ধের অঙ্গহানি না করিয়া যেমন ছিল তেমনিই ছাপাইতে দিলাম। বধূমাতারা এবং অন্য আত্মীয়ারা কিছু মনে করিবেন না। ইতি—

পুর্ব্বেই বলিয়াছি কথা বাড়াইয়া বলা মানুষের স্বভাব; অতএব কোন কথা শুনিলে আগে ভাল করে না জানিয়া বিশ্বাস করা উচিত নহে। মনে কর তুমি কাহারো নিকট শুনিলে "আমি মরিয়া গিয়াছি।" অমনি কাঁদিয়া কাটিয়া আকুল হয়ে ধরাশায়ী হইলে। তারপর ৩ দিন হবিষ্যি করে চতুর্থ দিনে রীতিমত চতুর্থী করিয়া দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ভোজন করানো হইল। শেষে পঞ্চম দিনে তোমার প্রেরিত লোক আমার বাড়ী হইতে ফিরিয়া গিয়া তোমাকে বলিল,—"হাঁ বাঁচিবার কোন ভরসাই ছিলনা, তবে এযাত্রা ভগবান রক্ষা করেছেন।" এখন তোমার এই ব্যস্ততায় লাভের মধ্যে অনাবশ্যক দারুণ মনোকষ্ট ও অধিকন্তু

চতুর্থী কার্য্য ও ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যয় নিরর্থক হইল; আরো যখন সত্য সত্য মরিব তখন হয়ত কিছুই করিবে না।

এইজন্য বলি কোন নিন্দার কথা শোনা মাত্র নিজের দোষ-শূন্যতা প্রমাণ করে ছাফাই দিতে যেওনা। হয়ত এমন হইতে পারে যে, কোন ব্যক্তি না বুঝিয়া তোমার নিন্দা করিয়াছে। এখন সেই কল্পিত নিন্দার জন্য বক্তাকে শাসন করিতে গেলে, সে তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং মিথ্যা নিন্দাকে সত্য বলে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবে এবং সকলেই তার কথা বিশ্বাস করিবে, যেহেতু পরের কুৎসা অবিচারে গ্রহণ করিতে ইতর সাধারণের বেশ একটু আমোদ আছে। তার চেয়ে তুমি অবিচলিত ভাবে নীরব থাকিলে নিন্দাকারী নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অতঃপর তোমার একান্ত ভক্ত ও প্রশংসাবাদী হয়ে দাঁড়াবে।

আবার প্রশংসা শুনিলেই আহ্লাদে উৎফুল্ল হয়ে নাচিবে না কারণ যে তোমার প্রশংসা করিতেছে সে হয়ত মন বুঝিবার জন্য কিম্বা খোষামোদ দ্বারা সন্তুষ্ট করে কিছু ঠকাইয়া লইবার উদ্দেশ্যেই পাঁচটা মিথ্যা প্রশংসা করিয়াছে। এমত অবস্থায় তোমার সেখান হইতে উঠিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নিজের প্রশংসা নিজের কাণে শুনিতে ইচ্ছা করিলে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ অর্থাৎ খেলো হইতে হয়।

———•———

পবিত্রতা।

পবিত্রতা দুইপ্রকার—শারীরিক ও মানসিক অর্থাৎ বাহ্য ও আভ্যন্তরিক। বাহ্য-পবিত্রতা যাহাকে সাধারণতঃ পরিচ্ছন্নতা বলে, তাহা সকলেই করিয়া থাকে,—বিশেষতঃ শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক সমধিক পটু ও তৎপর। কিন্তু মনের ময়লা দূর করিতে কয় জন চেষ্টা ক'রে থাকে? অর্থাৎ শরীর পরিষ্কার করা অপেক্ষা মন পরিষ্কার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য তাহা কয় জনে বোঝে? আবার বুঝিলেই বা করিতে চায়? যেহেতু উহাতে অনেক প্রকার সুখভোগ ইচ্ছা ত্যাগ করা আবশ্যক;—অনেক প্রকার সংযম শিক্ষা চাই।

একজন ম্যাথর সারাদিন ময়লা ঘাঁটিয়া সন্ধ্যাবেলা সাবান মাখিয়া স্নান করিয়া ভাল কাপড় প'রে গোঁপে একটু আতর মেখে, ফুলবাবু সাজিতে পারে। লোকে তখন আর উহাকে ম্যাথর বলিয়া ধরিতে পারেনা; কিন্তু তার মনে যদি চুরি করা কি অন্য কোন পাপ অভিসন্ধি থাকে তাহা কেউ কোন রকমে ধরিতে পারে না। যেহেতু দেহ পরিষ্কার কি অপরিষ্কার তাহা অনায়াসেই বোঝা যায়; কিন্তু মন, সেই এক অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর কেহই দেখিতে পায় না। শরীরের বেলায় লোকের চোকে ধুলো দেওয়া যায় না, কিন্তু মনের গুপ্ত পাপ কেবল মাত্র ভগবানের অগোচর থাকে না। তাই বলি শরীর নির্ম্মল করা যত সহজ, মন নির্ম্মল, নিষ্পাপ করা তত সহজ নহে,—কি মোটেই পেরে ওঠা যায় না। সে কেবল এক মুনি ঋষিরা যদি পারিয়া থাকেন;

তাও সকলে সর্ব্বপ্রকারে পারেন নাই, যাহা আমরা ভারত পুরাণে দেখিতে পাই। তবে একান্ত মনে চেষ্টা করিলে, মন যে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল, নিষ্পাপ ও পবিত্র হইতে থাকে ইহা অতি সত্য কথা।

কুগ্রন্থ পাঠ, কুদৃশ্য দেখা, কুৎসিত অভিনয় বা ছবি দেখা কুসংসর্গে থাকা, কদালাপ, কুচিন্তা এমন কি সমবয়স্কাদের সঙ্গে রঙ্গ, তামাসা, উপহাস, রহস্য, কৌতুক, ছলে অশ্লীল কথা ও অশ্লীলভাব-ব্যঞ্জক বাক্য প্রয়োগ করিতে নাই, তাহাতে ক্রমে ক্রমে মনের অধঃপতন হ'য়ে আত্মা কলুষিত হয়ে যায়, সুতরাং অচিরে ভগবানের কোপ আনয়ন করে।

যেমন নাকি পঙ্কিল জলে সূর্য্যের উজ্জ্বল ছবিরও প্রতিবিম্ব পড়ে না; যেমন নাকি কালিমাখা আর্শিতে মুখ দেখা যায় না, তেমনি পাপ কলুষিত মনে ভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে না, আবির্ভাব হওয়া ত দূরের কথা। যেমন নাকি আগাছার একটু অঙ্কুর হইলেই তাহা তক্ষণি তুলিয়া না ফেলিলে কিছুকাল পরে তাহা সমস্ত উদ্যানে পরিব্যাপ্ত হয়ে, সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট করে ফেলে, সেইরূপ সামান্য একটু পাপ চিন্তা মনে উদয় হওয়া মাত্রেই তাহা নষ্ট করিয়া ভগবানের নাম স্মরণ পূর্ব্বক আবার মন পূত পবিত্র ক'রে লইতে হয়, নতুবা পাপ চিন্তা হইতে ক্রমে মন পাপ কার্য্যে ধাবিত হইতে থাকে। অবশেষে ঘোর পাপী হইয়া এই দুর্লভ মানব জীবন, যাহা ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধন জন্য সৃষ্ট হয়েছিল তাহা একেবারেই ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে যায় ইহা অপেক্ষা দুঃখের ও দুর্ভাগ্যের বিষয় আর অধিক কি হইতে পারে?

যখন এই জন্মের পাপপুণ্য হিসাবে আগামী পরজন্মের সুখদুঃখ, ভালমন্দ, উন্নতি অবনতি, নির্ভর করিতেছে, তখন

ইহকালের একটী ভুলের জন্য জন্ম জন্মান্তর পর্য্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে কোন মূর্খ প্রবৃত্ত হইবে? অতএব সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া নিষ্পাপ হৃদয়ে ভগবান স্মরণ করত সংসারের করণীয় করিতে থাকিবে। সুখ দুঃখ, আরাম কষ্ট, কিছু মনে করিয়া, কিম্বা কোন প্রকার আশা হৃদয়ে পোষণ করতঃ প্রলুব্ধ হৃদয়ে করিবে না; তাহাতে পরিণামে ঠকিতে হইবে।

সৎসঙ্গ, সদালাপ, সৎগ্রন্থ পাঠ ও সৎ চিন্তাতে মন ক্রমশঃ পবিত্র হইয়া ভগবানের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠে। তখন যে আনন্দ উপভোগ করা যায়, তাহা মানব জীবনে দুর্ল্লভ—জগতেও দুর্ল্লভ। তাহা রাজার মুকুটে নাই. ধনীর রত্নস্তূপে নাই, বিলাসীর বিলাস সামগ্রীতে নাই, সুন্দরীর মুনিমনোমোহন সৌন্দর্য্যে নাই। তাহা কেবল ভগবৎ-প্রেমিকের হৃদয় ক্ষেত্রে প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় চিরশোভাময় ও চিরশান্তিপ্রদ। এই দুর্ল্লভ ধন লাভ করিতে কত বুদ্ধদেব, কত শঙ্কর চৈতন্যদেব প্রভৃতি সাধু মহাত্মাগণ, রাজ্যপাঠ, সংসার, স্ত্রীপুত্র, সুখ স্বচ্ছন্দতা এমন কি জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া কঠোর, তপস্যাদ্বারা পরমাত্মায় নিজ আত্মা লীন করত নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেছেন। এ সমস্ত অতি উচ্চদরের কথা সুতরাং তোমার আমার বুদ্ধির ও ধারণায় অগম্য।

মহাত্মা বিবেকানন্দ স্বামী বলিতেন,—আমরা নিজেকে মন্দ বলে ভাবিতে ভাবিতে শেষে বাস্তবিক মন্দ হয়ে যাই। আবার ভাল বলে ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশঃ ভাল হয়ে উঠি। আমার মেয়ে কমলাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিতে গেলে, উহারা রেজেষ্ট্রীতে কুমারী কমলা বালা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া নাম লিখিতে চেয়েছিল, আমি তাহাতে আপত্তি করেছিলাম। আবার উহার বিবাহের পরে

শ্রীমতী কমলা মুখোপাধ্যায় বলিয়া পত্র আসিতে লাগিল আমি তাহাতেও আপত্তি করেছিলাম। আমার ছোট মেয়ে অমলার বেলাও ঠিক ঐরূপ হয়েছিল। শেষে আমার লেখা এই পুস্তিকার পূর্ব্ববর্ত্তী সেই খাতা দেখিয়া জামাতা বাবাজীরা নিজেরাই সংশোধন ক'রে, সেই থেকে "দেবী" বলিয়া পত্র লিখিয়া থাকেন। আমি তোমাদের এই দেবত্ব-ব্যঞ্জক "দেবী" সংজ্ঞা কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। তোমরা নামে দেবী, কাজে দেবী, মনে দেবী, সর্ব্ববিষয়ে দেবী থাকিবে; নতুবা মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি মনুষ্য পদবী দ্বারা আপাততঃ "মানবী" হইলে ক্রমে শীঘ্রই "দানবী" হয়ে দাঁড়াবে যেহেতু প্রকৃতি কখনই একস্থানে স্থির থাকে না,—হয় উর্দ্ধদিকে নয় অধোদিকে সে যাইবেই,—সুতরাং মানবী-দানবী হইতে কতক্ষণ? যেমন নাকি রোগী ব্যক্তি নিয়ত রোগের চিন্তা করিতে থাকিলে তার রোগ আরাম হওয়া দূরে থাক্, ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে পক্ষান্তরে নিজেকে নীরোগ ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে। আমাদের মনের এমনই ক্ষমতা আছে যাহা শারীরিক বল অপেক্ষা কোন অংশ কম নহে।

লোভ।

লোভের জিনিসে যদি ফঁাদ পাতা যায়।
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথায় এড়ায়॥

বড়সীতে টোপ গাঁথিয়া ছিপ দিয়ে মাছ ধরিতে তুমি দেখিয়াছ। আবার ফাঁদ, কি জাল পাতিয়া তাহাতে খাদ্য দ্রব্য ছড়াইয়া দিয়ে বেদেরা কি প্রকারে পাখী ধরে তাহাও শুনিয়াছ। এবং একটা প্রকাণ্ড সিন্দুকের একধারে ছাগল রাখিয়া সুন্দর বনে শিকারীরা কি প্রকারে ভয়ানক ব্যাঘ্র শিকার ক'রে থাকে তাহাও শুনিয়াছ। এখন, এই সব ইতর জন্তুকে লোভ দেখাইয়া ধরা যায় এবং মারা যায়। কিন্তু মানব,—যে ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব এবং হিতাহিত বিবেচনাশক্তি বিশিষ্ট হইয়া যদি লোভে প'ড়ে নিজ অনিষ্ট সাধন করে ও শেষে প্রাণ হারায়, তাহা নিতান্ত লজ্জার কথা বলিতে হইবে।

চোর ডাকাত, নরঘাতকেরা অর্থ লোভে কি কুকার্য্যই না করে থাকে? শেষে ইহাদের, ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট হয়। তাদের দুর্দ্দশার কথা সকলেই জানে। আবার, অর্থ লোভে জ্ঞাতি জ্ঞাতিকে, ভাই ভাইকে, পর্য্যন্ত ঠকাইতে ছাড়েনা, যাহার পরিণাম ফল, নরহত্যা পর্য্যন্ত হইতেছে ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। অতএব মনে রাখিবে,—

"লোভে পাপ পাপে মৃত্যু শাস্ত্রের বচন।
অতএব কর সবে লোভ সংবরণ॥"

আমরা সচরাচর পেটুকের লোভের নিন্দাই করে থাকি।

বস্তুতঃ আহারে লোভ ভিন্ন অন্য শত প্রকারের লোভ আছে যাহা সংযম দ্বারা দমন ও নিবৃত্ত করিতে হয়। বস্ত্র, অলঙ্কার, অর্থ, বিলাস ভোগ প্রভৃতি নানা বিষয়ের লোভ হইয়া মনে দারুণ দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হইয়া থাকে; যাহার পরিতৃপ্তি জন্য নির্ব্বোধ লোকে চৌর্য্য প্রভৃতি পাপ কার্য্য করিতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা জানেনা যে, লোভ নিবারণেব একমাত্র ঔষধ নিস্পৃহতা ও সন্তোষ। লোভ রিপু যতই প্রশ্রয় পায় ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উহা অঙ্কুরেই দমন করা উচিত।

তবে সাধু জীবনের পুণ্যফলজনিত যে নির্ম্মল সুখ ভোগ তাহার লোভ নিয়ত করিবে। তাহাতে সেই দিকে মন ধাবিত হইয়া অন্য অপকৃষ্ট ঘৃণিত সুখ ভোগ লালসা মনে উদয় হইবার অবকাশ পাইবে না। সুতরাং মনের অধোগতি না হইয়া উন্নতি হইতে থাকিবে; অবশেষে স্বর্গীয় সুখ ভোগের অধিকারী হইতে পারিবে। অপর পক্ষে পার্থিব কোন দ্রব্যের প্রতি লোভ জন্মিলে যদি সদুপায় দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া ভোগ করিবার জন্য মন উত্তেজিত হয় তবেই লোভের শুভ ফল বলিতে হইবে।

——:*:——

পরচর্চ্চা।

সাধারণতঃ বাংলাদেশের স্ত্রীলোকের এই একটী বড় মন্দ অভ্যাস আছে যে, তাহারা পাঁচজনে একত্র হইলেই—তা পুকুরের ঘাটেই হউক, কি পথেই হউক কিম্বা বাড়ীতেই হউক, পাঁচজনে একত্র হইলেই পরনিন্দা, পরপ্রসঙ্গ হইবেই হইবে। এ অভ্যাসটী তাহাদের ত্যাগ করা অতি কর্ত্তব্য। যেহেতু যাহার বা যাহাদের নিন্দা করা যায়, কি নিন্দা ব্যাপারে যোগ দেওয়া যায় কিম্বা সমর্থন করা যায় তাহারা তোমার শত্রু হয়ে উঠে। আরো ইহাতে কিছুমাত্র লাভ নাই কিন্তু তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার আত্মার অবনতি হইতে থাকে, কারণ ঐ সব নিন্দনীয় কার্য্যের আলোচনা করিতে করিতে শেষে উহাতে আর ঘৃণা থাকেনা এবং সেই সেই কাজ নিজে করিতে ইচ্ছা হইতে থাকে। যেমন, যে ব্যক্তি কখনো পেঁয়াজ খায় নাই; তাহাকে পেঁয়াজ দেওয়া ব্যঞ্জন খাইতে দিলে সে কখনই খাইতে পারে না। জোর করিয়া খাইলে বমি হইয়া যায় কিন্তু প্রতিদিন একটু একটু ক'রে অভ্যাস করিলে শেষে বিনা পেঁয়াজের ব্যঞ্জন তার কাছে সুস্বাদু লাগেনা। এইরূপ সমস্ত পাপ কাজের বেলায় জানিবে।

পরচর্চ্চা, পরনিন্দা যারা ক'রে থাকে তারা অবশ্যই ক্ষুদ্র-চেতা। তাদের মন নিতান্ত সংকীর্ণ তাই পরের কুৎসায় আনন্দ অনুভব করে। তাহারা মনে মনে ভাবে, যে ওরূপ দোষ তাহারা কখনই করে নাই কিম্বা করিবে না। বাস্তবিক তাহা নহে। যেরূপ দোষের সমালোচনা ক'রে উহারা আনন্দ অনুভব করে,

উহা অপেক্ষা গুরুতর দোষ তাহারা করিয়াছে কিম্বা সময় ও সুবিধা পাইলে করা কোন মতে অসম্ভব নহে। যাহারা যতবেশী দোষযুক্ত কিম্বা দোষ-প্রবন-ধাতু-বিশিষ্ট, তাহারাই বাচালতা দ্বারা নিজের দোষ ঢাকিতে ও পরের দোষ প্রকাশ করিতে তৎপর। যাহারা গুণবতী তাহারা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে চায়না। আর যাদের গুণ নাই তারাই বাচাল হয় এবং পর নিন্দা করে; যেমন নাকি ভরা কলসী বাজে না, শূন্য কলসী বাজে। সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে,—

অগাধজল সঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডূষ জল মাত্রেণ সফরি ফর্ ফরায়তে॥

অর্থাৎ গভীর জলে রুই মাছ নাহি নড়ে চড়ে, অল্পজলে পুঁটী মাছ ছুটা ছুটী করে। সেইরূপ যার যত গুণ কম, ক্ষমতা কম, সে তত বেশী আস্ফালন করে, তত বেশী বকে এবং পরের অল্প দোষের বেশী নিন্দা করে অর্থাৎ বাক্যের আড়ম্বরে নিজের হীনতা ঢাকা দিতে চায়। কিন্তু প্রকৃত গুণবতী সর্ব্বদাই নীরব ও গম্ভীর থাকে; তাহার শরীরে যে কিছুমাত্র গুণ আছে একথা কেহই বুঝিতে পারেনা। অথচ কাজ উপস্থিত হইলে তখন তাহার গুণ গরিমা প্রকাশ পায়—ফলেন পরিচীয়তে।

আর একটী কথা,—যাদের কোন কাজ কর্ম্ম নাই, কোন প্রকারে সময় কাটানো যায় না, তারাই প্রায়ই পরচর্চ্চা লইয়া মনকে ব্যাপৃত রাখে। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে,— "অলস মন সয়তানের কারখানা', অর্থাৎ মন কোন প্রকারে কাজে নিযুক্ত না থাকিলে স্বতঃই নানা প্রকার "কু" মনে উদয় হইয়া থাকে। অতএব সাংসারিক কাজের অবসর সময়ে কোন সৎগ্রন্থ

পাঠ করিবে অথবা ছেলেপুলের জামা কি কাঁথা সিলাই করিবে অথবা একটু বড় ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাইবে। কিন্তু কোন সময়ই নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিবেনা। বরং ঘুমানো ভাল তবু নিষ্কর্ম্মাভাবে বসিয়া কেবল কুচিন্তা করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। সময় কাটাইবার মত কোন কাজ হাতে না থাকিলে কাজে কাজেই পাঁচজন সমবয়সীদের সঙ্গে তাস খেলা কি পরচর্চ্চা করার আবশ্যক হইয়া উঠে কিন্তু হাতে কাজ থাকিলে কুকাজ করিতে মন ধাবিত হয় না। অতএব সর্ব্বদা কিছু না কিছু কাজে মনকে নিযুক্ত রাখাই শ্রেয়ঃ।

স্বাধীনতা।

জীব মাত্রেই স্বাধীন থাকিতে ভালবাসে। স্বাধীনতা লাভ ভিন্ন মানব কিছুতেই নিজেকে সুখী মনে করে না। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা অনেক সময় বিপদের কারণ হইয়া থাকে; যে হেতু শারীরিক মাসসিক উভয় বৃত্তিতেই নারী পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল সুতরাং আত্মরক্ষায় অক্ষম; আরো স্ত্রীলোক বলিয়াই নানা কারণে নারীর উপর বেশী বিপদ পড়িবার আশঙ্কা করা যায়। এই সব কারণে আমাদের নীতিশাস্ত্র প্রণেতা মহর্ষি মনু আদেশ করিয়াছেন,—নারী বাল্যকালে পিতার বশীভূত থাকিবে যৌবনে স্বামীর বশীভূত এবং বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের বশীভূত থাকিবে। কোন সময়েই স্ত্রীলোক স্বাধীন থাকিবে না।

আজকাল ইংরাজ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় জাতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীন ভাবে চলিতে না দেওয়াতে তাদের প্রতি অবিচার করা হইতেছে। কিন্তু আমি বলি প্রগাঢ় নীতিবেত্তা মহর্ষি মনু যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাহাদের প্রতি অবিচার করা দূরে থাকুক, নিতান্ত দয়া প্রকাশ করা হয়েছে। যেহেতু সমস্ত আপদ বিপদ, দুঃখ কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা পুরুষে নিজের স্কন্ধে লইয়া নারীকে সুখস্বচ্ছন্দতা ও আরামের মাত্র ভোগী করা হয়েছে। ইহাতে কি তাহার প্রতি অবিচার হয়েছে?—না অনুগ্রহ করা হইয়াছে?

মনে কর নারী যেন একটী লতা। উহাকে ইচ্ছামত চলিতে ও বাড়িতে দাও সে দুই চারি হাত এপাশে ওপাশে গড়াইয়া

গড়াইয়া বড় জোর এক হাত কি দুই হাত উচু হইয়া পরে অধঃপতিত ও ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া ছাগ ও গো মহিষাদির পদদলিত ও ভক্ষিত হওয়ার চেয়ে কোন পুরুষরূপ বৃক্ষের আশ্রয় অবলম্বনে উর্দ্ধগামী হইয়া স্বর্গীয় নির্ম্মল বায়ু সেবন ও স্বাস্থ্যপ্রদ সুমিষ্ট সূর্য্য-কিরণ উপভোগ করা কি সুবুদ্ধি ও সুখের লক্ষণ নহে? আমি আবার বলি নারী, পুরুষের অধীন থাকে বলিয়া তাহার গায়ে কিছুমাত্র সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা স্পর্শ করে না,—সমস্ত ঝঞ্ঝাবাত, শীততাপ পুরুষের উপর দিয়া বহিয়া যায়। এখন এই যন্ত্রণাহীন সুখের অবস্থা ভোগ করিতে পারিয়া নারী কত সৌভাগ্যবতী তাহা বুদ্ধিমতীরাই বুঝিয়া দেখিবেন।

এ প্রসঙ্গে আমার নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে। যতদিন আমার পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, ততদিন আমি তাঁর অধীনে থাকিয়া কত নিশ্চিন্তভাবে ও আমোদে আহ্লাদে দিন কাটাইয়াছি। তারপর তিনি স্বর্গগত হইলে, সংসারের ভার আমার ঘাড়ে পড়ায় আমি কত অসুখে দিন কাটাইতেছি। আমি অনেকস্থলে দেখিয়াছি, যে পরিবারে পুরুষ অবিভাবক নাই, যেখানে স্ত্রীলোকই কর্ত্তা, সেখানে কতই না গণ্ডগোল, কতই না বিশৃঙ্খলা। সেই কর্ত্তা-স্ত্রীলোকটী কতই না দুর্দ্দশাগ্রস্তা, যেন মাঝীহীন নৌকা সমুদ্রের মধ্যে ঝড়ে তোলপাড় খাইতেছে ও শীঘ্রই ডুবিয়া যাইবে। বহু বড় পরিবারের বিধবা গৃহিনী কর্ত্রীকে কাঁদিয়া বলিতে শুনিয়াছি, তাঁহার স্বর্গীয় কর্ত্তার অভাবে, এই সংসারের ভার তাঁহার ঘাড়ে পড়ায় কত কষ্টেই তাঁর দিন কাটিতেছে! তাঁহার এই বিলাপ ও আক্ষেপ দাম্পত্যসুখে বঞ্চিতা হয়েছেন বলিয়া তত নহে, যত নাকি সংসারের অসহনীয় দুর্ব্বহ ভার তাঁর

ঘাড়ে পড়িয়াছে বলিয়া। বর্ত্তমানে এই সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে স্বামীর চিতার আগুনের জ্বালা তাঁর পক্ষে বহুগুণে সুশীতল বোধ হইত; কিন্তু এখন আর সে আক্ষেপে ফল নাই।

যদি তুমি প্রকৃত সুখশান্তি চাও এবং সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার পাইতে চাও তবে কখনই স্বাধীন ভাবে নিজের কর্ত্তৃত্ব চালাইতে যাইও না। তুমি বুদ্ধিমতী হও ভালই, তথাপি স্বামী অথবা দেবর কিম্বা সংসারের অন্য কোন পরম আত্মীয় পুরুষের সহকারিণী ভাবে সংসার চালাইবে। পুরুষ অভাবে শাশুড়ী কি বয়স্থা ননদের পরামর্শ লইবে। ইহাতে তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে তোমারই দ্বারা পরিচালিত হইবেন অথচ নিজেরা কর্ত্তৃত্ব করার সম্মান পাইতেছেন ভাবিয়া তোমার প্রতি বিরূপ থাকিবে না।

অলঙ্কার প্রিয়তা।

গয়না পরিতে ভালবাসা, স্ত্রীলোকের একটী প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। পৃথিবীর সমস্ত দেশের স্ত্রীলোকেই অল্প বিস্তর গয়না পরিয়া থাকে। অতি অসভ্য জাতীয় স্ত্রীলোক গয়নার অভাবে নানা প্রকার উল্কি পরিয়া অথবা পাখীর রং বেরঙ্গের পালক চুলে গুঁজিয়া, অথবা সমুদ্রতীরের ঝিনুক শামুখের মালা পরিয়া গয়নার সাধ মেটায়। কিন্তু কোনো স্ত্রীলোক কি ভাবিয়া দেখিয়াছে এই গয়না পরার সাধ তাদের কেন হয়? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, গয়না পরিয়া তাদের শরীরে কেমন একটা যন্ত্রণা ও অসোয়াস্তি বোধ হয় যাহা প্রকাশ করিতে লজ্জা পায় বলিয়া নীরবে সহ্য ক'রে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে চোর ডাকাতের ভয় ত আছেই। তবে কেন তারা পরিতে চায়? উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা, আর লোকের নিকট বড়লোক বলিয়া সম্মান প্রাপ্তির আশা। কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখেনা যে ইহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতি কত বেশী।

গয়না গড়াতে গেলে কতকগুলি টাকা স্যাকরা "বানি অর্থাৎ মুজুরী বলিয়া লয় তারপর "পান" বলিয়া রূপা তামা মিশায়ে আর কতকগুলি টাকা চুরি করে নেয়। তারপর ফি বছর ঘসিয়াঘসিয়া কত সোনা কমিয়া যায়। এই সব হিসাব করিলে দেখা যায় গয়না প্রস্তুত জন্য যে টাকা প্রথমে ব্যয় করা যায়, ১০ বছর পরে সেই গয়না বিক্রী করার আবশ্যক হইলে সেই টাকার অর্দ্ধেকও ঘরে আসে না। তারপর সোণার দাম কমারও ভয় আছে। মহাযুদ্ধের সময় ও তার কিছু দিন পরে পর্য্যন্ত যে সোণার ভরি

৩০৲ ৩২৲ ছিল এখন তার দাম ২০৲তে নামিয়াছে, হয়ত পরে আরো নামিতে পারে। সুতরাং সেই সময় যাঁরা গয়না গড়াইয়া ছিলেন তাঁরা এখন তার সিকি টাকাও ফেরত আনিতে পারে না। তার চেয়ে ব্যাঙ্কে রাখিলে ১০ বছর পরে সুদে আসলে দুনো পাওয়া যায়। ব্যাঙ্কে চোর ডাকাতের ভয় নাই কিন্তু গয়নার বেলায় ঐ ভয়ে সাহস করে গয়না পরা যায় না ঘরেও রাখা যায় না কারণ উহাতে প্রাণ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি ব্যাঙ্কটী ফেল ময়, তাতে ঝড়, বন্যা মহামারির, মত দেশ শুদ্ধ লোকের যে দশা আমারও সেই দশা সুতরাং দুঃখ করার কারণ থাকেনা। আবার ব্যাঙ্ক ফেল হইলে মাত্র টাকাই নষ্ট হইতে পারে কিন্তু গয়নার কল্যানে ডাকাতের দ্বারা ধনে প্রাণে যায়। আহা এই কলিকাতা সহরে প্রতি বছর গয়না পরিহিত কত সুন্দর শিশু সন্তান দস্যু কর্ত্তক অপহৃত ও বিনষ্ট হইয়া থাকে তাহা সকলেই জানিতেছেন।

অলঙ্কারে সৌন্দর্য্য বাড়ায় বটে কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে। যে নারীর ভগবানের দেওয়া সৌন্দর্য্য আছে তার আর কৃত্রিম উপায় অবলম্বনের দরকার কি? যে স্ত্রী অধিক গয়না পরিবার জন্য জিদ্ করে, তার কিছু মাত্র নিজের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নাই ইহাই প্রমাণিত হয়, ইংরাজ মহিলারা এবং কলিকাতায় ঠাকুর বাবুদের বাটীর স্ত্রীলোকেরা এবং ব্রাহ্মনারীরা কি গয়না পরিয়া সৌন্দর্য্য বাড়াইতে বোঝেন না? তাঁরা পরেন না যেহেতু তাঁরা জানেন, ইহাতে যে পরিমাণ সৌন্দর্য্য বাড়ায় তার চেয়ে অপব্যয় বেশী হয়। তাই তাঁরা সামান্য ২।১ খানিতে সন্তুষ্ট থাকেন। তবে তাঁরা যে পোষাক বেশী পরেন তার দাম গয়নার

তুলনায় অনেক কম। যদি বল ছেলের বিয়ের সময় গয়না না লইলে ঠকা হয়। কেন? মেয়ের বাপের কাছে সেই পরিমাণ নগদ টাকা লইলেই হইল। তিনি তাঁর মেয়েকে এয়োতির চিহ্নস্বরূপ ২।১ খানা দিয়া বাকী টাকা তাঁর মেয়ের নামেই ব্যাঙ্কে জমা করুন এবং তিনি তাহাই সুবিধাজনক বোধ করিবেন।

যদি বল গয়নায় মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি পায়, তদুত্তরে বলা যায় উপরোক্ত স্ত্রীলোকেরা কি গয়নার অভাবে কম সম্ভ্রম পাইয়া থাকেন? ওসব কথা কিছু নয়, আসল কথা হচ্ছে,—মেয়ে লোকেরা অনেক সময় না বুঝিয়া সুঝিয়া, অপরের দেখাদেখি হুজুগে পড়িয়া অনেক অকর্ত্তব্য করিয়া থাকেন। যদি বল, গয়না বুড়া বয়সের একটা সম্বল, কিন্তু সেটীও ভুল। কারণ ঐ সব গয়না অনেকের পক্ষে বুড়া বয়স পর্য্যন্ত থাকে না, হয় ক্ষয়ে যায়, না হয়, চোর ডাকাতে নেয়, না হয় ছেলে কুসংসর্গে পড়ে জোর করে কেড়ে নেয় কিম্বা ক্রিয়া কর্ম্ম করার সময় বন্ধক দেওয়া হয় যাহা প্রায়ই খালাষ করা হইয়া উঠে না; সুতরাং বৃদ্ধ কালের সম্বল হইবে বলিয়া একটা ভুল স্তোক বাক্য দ্বারা নিজ মনকে ও স্বামীকে বুঝাইয়া আপাততঃ কতকগুলি টাকা জলে ফেলা হয়—যে টাকা একবার সিন্দুক হইতে বাহির হইলে আর সিন্দুকে উঠিবে না—যে টাকা আনিতে কত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়েছিল, কত বিপদে পা দিতে হয়েছিল—যে টাকা থাকিলে আজ নিজের সন্তানগুলি প্রতিপালিত, শিক্ষাপ্রাপ্ত ও চিকিৎসিত হইতে পারিত এবং আবশ্যকের বেশী থাকিলে ৫ জন দরিদ্র, অভাবগ্রস্তের উপকার করা যায়; কিন্তু বুদ্ধির দোষে সেই মূল্যবান অর্থ গয়নার

নামে ধূলা মুঠার ন্যায় ছড়াইয়া ফেলা হইতেছে। ভাবিয়া দেখ সংসারের আবশ্যক খরচ বাদে ঐ পরিমাণ টাকা সঞ্চয় করা, আজি কাল্‌কার কঠিন যুগে কত কঠিন তা ভুক্তভোগীরাই জানেন, মেয়ে লোকে তার কি বুঝিবে? তারা সুখের পায়রা; যতক্ষণ স্বামীর সৌভাগ্য সম্পদ আছে ততক্ষণ তারা আছে কিন্তু স্বামীর ভাগ্য বিপর্য্যয়ে হয় বাপের বাড়ী (যদি সেখানে মাথা রাখিবার স্থান থাকে) নতুবা শেষ আশ্রয় কেরাসীন তেল! অবশ্য সকলেই এই ধরণের নহে তবে কেউ কেউ ঐ শ্রেণীর আছেন।

যা বলিতেছিলাম,—গয়না গড়াইয়া কতকগুলি টাকা নষ্ট না করিয়া ঐ পরিমাণ টাকা সেই স্ত্রীলোকটীর নামে ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখিলে তার সুদে ব্রত নিয়ম করা যায় এবং মৃত্যুর পরে ছেলে-মেয়েরা ঐ টাকা পাইয়া কত উপকার বোধ করিবে। এমন কি ঐ টাকা দ্বারা অধিকারিণীর শ্রাদ্ধশান্তিও হইতে পারিত। কিন্তু এসব কথা কেহ কি গয়না গড়ানর আগে একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? কখনই নহে, কারণ তাহলে এত বড় একটা মস্ত ভুল কেহই করিতেন না।

আর একটা কথা বলা হয় নাই। গয়নার আবশ্যকতা সম্বন্ধে যদি বল মেয়ের বিবাহের সময় মায়ের গয়না ২।১ খান দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে। সে কথাও ভুল কারণ,—বরের বাপ সেই ঘসা পুরাণো সেকেলে ফ্যাসানের গয়না নিতে চাইবে না। তার চেয়ে সেই পরিমাণ টাকা মেয়ের নামে ব্যাঙ্কে জমা করা থাকিলে বিয়ের সময় সুদে আসলে একখানা স্থানে দুখানা গয়না হতে পারিত অথচ হাল ফ্যাসানের ও বরের বাপের সন্তোষজনক হইত। অথবা বরের বাপের সম্মতিক্রমে সেই পূরো টাকা শুদ্ধ ব্যাঙ্কের

পাশ বহি মেয়ের সঙ্গে সম্প্রদান করিতে পারিলে সব চেয়ে উত্তম হয়।

এস্থলে একটা সত্য গল্প বলিয়া আমার এই সত্য এবং উপকারী অথচ তোমাদের অপ্রীতিকর প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রায় ১০০ কি ১৫০ বছর আগে নবদ্বীপের কাছে নির্জ্জন বনমধ্যে কুটীর বান্ধিয়া রামনাথ নামে একজন অসাধারণ পণ্ডিত সস্ত্রীক বাস করিতেন। "তাঁহার খুব কষ্টে সংসার চলে" লোকমুখে এই কথা শুনিতে পাইয়া কৃষ্ণনগরের রাজা তাঁহাকে কিছু সাহায্য করার অভিপ্রায়ে একদা তাঁহার কুটীর সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! আপনার যদি কিছু অভাব অনাটন থাকে, বলুন আমি তাহা পূর্ণ করিয়া দিতেছি।" পণ্ডিত রাজার প্রশ্নে যথোচিত বিস্ময় সহকারে উত্তর দিলেন--"মহারাজ, আপনি এ অলীক বাক্য কাহার নিকট শ্রবণ করিয়াছেন? বর্ত্তমানে আমার কিছুমাত্র অভাব অনাটন নাই। মহারাজের প্রদত্ত আমার যে দুই বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মত্র ভূমি আছে তাহার উৎপন্ন ধান্য, কৃষকের প্রাপ্য অর্দ্ধেক দিয়াও স্বামী-স্ত্রীর সম্বৎসর বেশ চলিয়া যায়। আর উঠানে যে তেঁতুল গাছটি দেখিতেছেন উহার পাতা সিদ্ধ অম্বলে অন্নের বেশ চমৎকার উপাদান হয় এবং দান প্রাপ্ত ২।৪ খান বস্ত্র ও গামছায় উভয়ের লজ্জা নিবারণ হইয়া থাকে। সুতরাং বর্ত্তমানে আমার আপনার সাহায্যের আবশ্যকতা নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতে পারেন।

রাজা কিন্তু নাছোড়বান্দা। তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে রামনাথ পণ্ডিতের কোন প্রকার অভাব মোচনের সুযোগ আবিষ্কার করিতে না পারিয়া. পরিশেষে তাঁহার সহধর্ম্মিনীর শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন,

"মা! বলুন আপনার কোন অভাব আছে কিনা? আমি এই মুহূর্ত্তেই পূরণ করিয়া দিতেছি।" তখন ব্রাহ্মণী বলিলেন—"মহারাজ আমরা স্বামী-স্ত্রীতে এই বিজন বনে আপনার রাজ্যে পরম সুখে কাল যাপন করিতেছি; আমাদের কোন রূপ দুঃখকষ্ট কি অভাব অনাটন নাই।"

তখন রাজা নিতান্ত নিরূপায় হইয়া তাঁহার শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ দেখিলেন, তিনি একখান গামছা পরিয়া ও অপর একখান দিয়া বুক ও মাথা ঢাকিয়া কোন রূপে লজ্জা নিবারণ করিতেছেন এবং তাঁহার হাতে এয়োতির চিহ্নস্বরূপ লাল সূতা বাঁধা আছে। তখন রাজা নিতান্ত প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন,—আমি আপনাকে একজোড়া সুবর্ণ বলয় ও একখান পট্টবস্ত্র দিতেছি আপনি দয়া করে পরিধান করুন।"

রাজার মুখে এই কথা শুনিয়া সেই তেজঃশালিনী ব্রাহ্মণকন্যা যথোচিত বিস্ময় ও কোপ সহকারে উত্তর দিলেন;—রাজন্ এই আমার প্রকোষ্ঠে যে রক্ত সূত্র দেখিতেছেন উহা সমস্ত নবদ্বীপ, মিথিলা, কাশী ও কান্যকুব্জের পণ্ডিত মণ্ডলীর পরাজয়ের বিজয় পতাকা স্বরূপ আমার দিগ্বিজয়ী স্বামীর দীর্ঘায়ু সূচনা করিতেছে। আপনি উহা খুলিয়া ফেলিয়া হীরক মণ্ডিত সুবর্ণ বলয় পরিতে বলিয়া আমার পরমারাধ্য স্বামীর যথোচিত অবমাননা করিয়াছেন। নিশ্চয় আপনার মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে। আপনি সত্বর এস্থান হইতে প্রস্থান করুন।" তখন রাজা তাঁহার সেই তেজো-দৃপ্ত বদনমণ্ডল ও ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পলায়ন করিলেন।

এক্ষণে তোমরা বুঝিয়া দেখ এই কুটীর বাসিনী ভিক্ষোপজীবিনী

দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যা, প্রকৃত ভূষণ কি তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং প্রকৃত সুখ যাহা তাহাই লাভ করিয়াছিলেন। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যেমন নক্ষত্রদিগের ভূষণ চন্দ্র, তেমনি নারীদের ভূষণ পতি, সুতরাং যার পতি বর্ত্তমান আছে তার আর অন্য ভূষণের দরকার কি?

লজ্জাশীলতা।

লজ্জাই স্ত্রীলোকের প্রকৃত ভূষণ তাহা সকলেই স্বীকার করে। বলা বাহুল্য, বসন অলঙ্কারে ভূষিতা হইলেও লজ্জাহীনা নারী প্রকৃত শোভা-সম্পদ-লাবণ্যবিহীনা বলিয়া লোক সমাজে ঘৃণিতা ও অপদস্থা হইয়া থাকে। নির্লজ্জ স্ত্রীলোক অশেষ গুণসম্পন্ন থাকিলেও একমাত্র লজ্জার অভাবে কেমন যেন একটা মনোমুগ্ধ-কারিণী শক্তি কিম্বা কমনীয়তা তাহাতে নাই। তাই বলিয়া আমি বলিতেছি না যে সর্ব্বদা "কলাবৌ" হ'য়ে ঘরের কোণে লুকাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি মহারাষ্ট্রীয়া মহিলারা অবাধে রাস্তায় বাহির হন এবং পরপুরুষের সঙ্গে আবশ্যক মত দুই একটী কথাও ক'ন। তাই বলিয়া তাঁহাদের সেই সলজ্জ মুখের পানে ও সেই অনলবর্ষী চক্ষুর দিকে তাকায় কার সাধ্য? তাঁহাদের সেই কমনীয় এবং লজ্জাশীলা মূর্ত্তি, সেই গম্ভীর অথচ সদা প্রফুল্ল আনন, মৃদু অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক পাদবিক্ষেপ, অবলোকন করিলে মাতৃ সম্বোধন না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু যদি কোন পাষণ্ড নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ তাঁহাদের পানে পাপ কটাক্ষপাত করে, তবে নিদ্রিতা সর্পীর উপর পদবিক্ষেপ করিলে সে যেমন উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করত, বিস্ফারিত ফণা, অনলবর্ষী নয়নদ্বয় ও ভীষণ গর্জ্জন সহকারে সেই হতভাগ্য পদদলনকারীকে আক্রমণ ক'রে থাকে, উপরোক্ত মহারাষ্ট্র মহিলারাও উহা অপেক্ষা কোন অংশে কম নহেন। ইহাকেই বলে কোমলতায় উগ্রতা, মধুরতায় প্রচণ্ডতা। সৌদামিনী যেমন নিজ রূপলাবণ্যে

সকলের মন মুগ্ধ করে থাকে আবার আবশ্যক হইলে সমস্তই পোড়াইয়া ধ্বংস করিতে পারে; আমাদের আদ্যাশক্তি মহাকালী যেমন এক হস্তের দ্বারা অভয় প্রদান ও ভক্তকে মাতৃবৎ পালন করিতেছেন, কিন্তু অন্য হস্তে সংহার মূর্ত্তি খড়্গ ধারণ করে আছেন আবশ্যক মত প্রয়োগ করিবেন; আমি সেইরূপ লজ্জা চাই, যাহা সর্ব্বদাই বিনম্র, কমনীয় এবং সঙ্কোচিত অথচ আত্মরক্ষা কালে একবারে সংহার মূর্ত্তি! ইহাই—নারীর যথার্থ ভূষণ। আজকাল পূর্ব্ববঙ্গে পাষণ্ড গুণ্ডাদের দ্বারা হিন্দুনারীদের উপর যেরূপ অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে তাহাতে অচিরে ঘরে ঘরে পূর্ব্ববর্ণিত রূপ বীরা রমণীর আবির্ভাব হইবে। কারণ ভগবানের রাজ্যে অবিচার বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে না; তখন তিনি নিজেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাপের দলন করিয়া থাকেন এবং মানব, নিমিত্ত মাত্র হইয়া তাঁহার এই মহাদুষ্কৃতি-দলন কার্য্যের সহায় হয়।

তুমি রাত্রে ঘরে নিদ্রিত আছ—চোর ঘরে প্রবেশ করিয়া যথা-সর্ব্বস্ব লইতেছে, তুমি জানিতে পারিয়াও কোন প্রতিবিধান না করিয়া লজ্জা ও ভয়ে ঘরের কোণায় অথবা খাটের তলায় আশ্রয় লইলে! দেওয়ালের গায়ে শাণিত অসি ঝুলানো রহিয়াছে তুমি তাহা বেশ জানিতেছ কিন্তু তোমার এমন সাহস হইতেছে না যে উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া চোরকে উপযুক্ত আঘাত দাও। এরূপ লজ্জাভয় যে করে তাহাকে শত ধিক! তুমি রাত্রে রেলগাড়ীতে যাইতেছ; পথিমধ্যে কোন দুষ্ট বদমায়েশ অথবা তস্কর তোমার গাড়ীতে উঠিয়া যথাসর্ব্বস্ব লইতেছে। তুমি দেখিতে পাইয়াও ভয়ে গাড়ীর বিপদজ্ঞাপক শিকল টানিতে পারিলে না কিম্বা অন্য

পাঁচজন স্ত্রীলোকের সাহায্যে ঐ দুষ্টকে গাড়ীর জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে চেষ্টা না করিয়া ভয়ে বেঞ্চের তলায় লুকাইলে! এরূপ কার্য্যে লজ্জা অথবা ভয় তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তুমি কোন পার্ব্বণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে গিয়া ভীড়ে সঙ্গীহারা ও পথভ্রষ্টা হইয়াছ কিম্বা অন্য কোন দৈব ঘটনা বশতঃ একাকিনী কোন বিজন প্রান্তরে আসিয়া পড়িয়াছ এমন সময় কোন দুর্ব্বৃত্ত তোমাকে আক্রমণ করিলে তোমার লজ্জা তোমাকে বাঁচাইতে পারিবে না। তখন সেই লজ্জার বদলে তেজ চাই, কোমলতার বদলে দৃঢ়তা চাই, এবং অবলার বদলে মহাশক্তি চাই। তখন তোমার চক্ষু দিয়া অনল বর্ষিত হইবে, বাহু দ্বারা পাষাণ চূর্ণিত হইবে এবং পদ দ্বারা মেদিনী কম্পিতা হইবে। তবেই তুমি সেই সর্ব্ব সংহারিণী দৈবকুল-বিনাশিনী অথচ জগৎপালনী জগদম্বার মহাশক্তির অংশভূতা বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

তুমি লজ্জা বিনম্র ভাবে সমস্ত সাংসারিক কাজ করিবে। মৃদুগামিনী হইবে অথচ কার্য্যে তৎপর ও উৎসাহশীলা হইবে। মৃদু মধুর ও স্বল্প ভাষিনী হইবে অথবা আবশ্যক হইলে উপদেশ প্রদানে কুণ্ঠিতা হইবে না। ভাসুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে কথা না কহিলেও অপরের দ্বারা তাঁর ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করা কোন দোষের নহে। মনে কর তিনি কোন চাকরের এত টাকা পাওনা বলিয়া তাহাকে তাহা দিতে বলিলেন; তুমি হিসাব করিয়া দেখিলে কম পাওনা; এস্থলে কি লজ্জা করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিবে না? হাঁ অবশ্যই করিবে। অন্য এক সময় তোমার ভাসুর একটী কাজ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন কিন্তু তোমার বিবেচনায় ঐ কাজটী সংসারের ক্ষতিজনক। এমত অবস্থায় তোমার সুযুক্তি-

পূর্ণ অভিমত তাঁহাকে জানিতে দেওয়া উচিত তৎপরে তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিয়া যাহা ভাল বুঝেন করিবেন। গুরুজনের প্রতিবাদ করা বিশেষতঃ ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করা বিশেষ সতর্ক হইয়া লজ্জা বিনম্র ভাবে করিতে হয়। রূঢ় স্পর্দ্ধাসূচক ভাব যাহাকে স্ত্রীলোকে ইতর কথায় "জ্যাঠামী" বলে অথবা ধৃষ্টতা কি দাম্ভিকতার লেশমাত্র না থাকে। আবার তাহাও নিজে না করিয়া শ্বাশুড়ী ননদের দ্বারা করিতে হয়।

সতীধর্ম্ম

সতীধর্ম্ম, অর্থাৎ সতীদিগের করণীয় কার্য্য, অর্থাৎ পাতিব্রত্য। পাতিব্রত্য কাহাকে বলে?—পতি সেবা যাহাদের একমাত্র ব্রত, অর্থাৎ নিয়মানুযায়ী করণীয় বা পালনীয়, তাহাদের যে ভাব তাহাই পাতিব্রত্য। এখন পতিব্রতা কাহাকে বলে? ইহার উত্তর হিন্দুশাস্ত্রে এইরূপ আছে, যথা—

আর্ত্তার্ত্তে, মুদিতা হর্ষে, প্রোষিতে মলিনা কৃশাঃ।
মৃতে ম্রিয়তে যা নারী, সতী সাধ্বী, পতিব্রতাঃ॥

অর্থাৎ স্বামী পীড়িত হইলে যে নারী নিজেকে সেইরূপ পীড়িতা মনে করে, স্বামীকে হৃষ্টচিত্ত দেখিলে যে নারী প্রফুল্ল ও আহ্লাদিতা হয়, স্বামী বিদেশ গমন করিলে যে নারী তাঁর অদর্শনে মলিনা ও কৃশা হইয়া বেশভূষা ত্যাগ করে, সর্ব্বশেষে স্বামীর মৃত্যু হইলে যে নারী সহমৃতা হইয়া স্বামীর চিতানলে দেহ উৎসর্গ করে, সেই নারীই সতী, সেই নারীই সাধ্বী এবং সেই নারীই পতিব্রতা।

এক্ষণে কথা হচ্ছে, উপরের তিনটী লক্ষণ শুদ্ধ থাকিলে সতী হইবে না, আর শেষ সহমরণের আদেশটী অবশ্য পালন করিতে হইবে নতুবা পূরা সতী হইতে পারিবে না, ইহা যুক্তি সঙ্গত নহে। আধুনিক পণ্ডিত মণ্ডলী বহু শাস্ত্র দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, সহমরণের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মচর্য্য পালন আরো ভাল। তাই আমাদের ইংরাজ রাজা ঐ নিষ্ঠুর প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। তদনুসারে আজ কাল কোন সতী সহমরণ গেলে, কিম্বা কেহ অন্যকে সহমরণ যাইতে উৎসাহিত করিলে তাহার ফাঁসি হইবে। এই কারণে

আজকাল বিধবারা জীবিত কালে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন ও মৃত স্বামীর ধ্যান পূজা করিতে থাকিয়া মৃত্যুর পরে, পূর্ব্বমৃত স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া অক্ষয় স্বর্গসুখ ভোগ করে থাকেন। ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের অভিমত।

যাহাহউক পতিকে দেবতা জ্ঞানে আজীবন তাঁর সেবা শুশ্রূষা করা, কায়মনোবাক্যে তাঁর সন্তোষ সাধন করা, তাঁর ইচ্ছা পালন ও তুষ্টি সম্পাদন জন্য নিজ সুখ স্বচ্ছন্দতা এমন কি জীবন পর্য্যন্ত ত্যাগ করা, তৎপরে তাঁর মৃত্যু হইলে তদীয় প্রতিমূর্ত্তির পূজা ধ্যান করা ও সমস্ত প্রকার সুখভোগ, বেশভূষা ত্যাগ করতঃ একাহারে থাকিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করাই হিন্দু শাস্ত্রমতে হিন্দু বিধবাব একান্ত কর্ত্তব্য। অন্যদেশে অন্যধর্ম্মে কি বলে তাহা আমাদের জানার আবশ্যক নাই। আমাদের পিতৃপিতামহ যে পথে চলিয়া গিয়াছেন আমরাও সেই পথে চলিব তা বুঝিয়াই হউক কিম্বা অন্ধ বিশ্বাসেই হউক।

দক্ষরাজার কন্যা সতীদেবী পতিনিন্দা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করেছিলেন। সীতা, রাজকন্যা রাজপুত্রবধূ ও রাজরাণী হইয়াও পঞ্চম মাস গর্ভবতী অবস্থায় পতি কর্ত্তৃক বনে নির্ব্বাসিতা হয়েছিলেন, —বিনাদোষে, তবু স্বামীকে কটু বলেন নাই। দ্রৌপদী রাজকন্যা, রাজরাণী হইয়াও স্বামীগণ সিংহাসন ত্যাগ করে বনে গেলেন বলিয়া, তিনিও সন্ন্যাসিনী বেশে তাঁহাদের সহিত বনে বনে ভ্রমণ করেছিলেন। সেইরূপ নল রাজার পত্নী দময়ন্তী, শ্রীবৎস রাজরাণী চিন্তা, হরিশ্চন্দ্র রাজপত্নী শৈব্যা এবং সাবিত্রীদেবীও পতিসঙ্গে বনবাসে কতকষ্টই সহ্য করেছিলেন তথাপি পতিসেবারূপ মহাব্রত হইতে স্খলিত হন নাই। ইঁহারা এবং ইঁহাদের মত আরো শত-

শত পতিব্রতার কাহিনী মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা আদর্শ সতী।

এক্ষণে কথা হচ্ছে, উপরে যে সমস্ত পতিব্রতার নাম উল্লেখ করা গেছে, ইঁহাদের স্বামীরা সকলেই সাধু, সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক এবং নিজ নিজ স্ত্রীতে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু যদি কোন হতভাগিনীর স্বামী দুশ্চরিত্র, অসাধু ও পরদাররত হয় তবে সেই স্ত্রীর পক্ষে কি কর্ত্তব্য? ইহার উত্তরে হিন্দুশাস্ত্রকার এই বলেন যে স্বামীর দোষগুণ স্ত্রী বিচার না করিয়া পতিকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করাই স্ত্রীর একমাত্র কর্ত্তব্য। অন্ধ, আতুর, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে যে নারী আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে সেবা করিবে ও ভাল বাসিবে তার সতীধর্ম্ম সবিশেষ ফলপ্রদ হইবে। কারণ যে কাজ যত কঠোর; যে কাজ সম্পাদনে যত বেশী কষ্ট সহ্য করা আবশ্যক হয়, সেই কাজ তত বেশী মূল্যবান ও প্রশংসাযোগ্য। আবার স্বামী পাপী ও দুষ্কর্ম্মান্বিত হইলে তাঁহাকে সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করত ক্রমে সৎপথে আনিতে হইবে। তিরস্কার কি কঠোর ব্যবহার দ্বারা নহে, তাহাতে ফল আরো মন্দ হইবে।

এক্ষণে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধের কথা দুই একটী বলিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। স্ত্রী যে স্বামীর কেবল ভোগ্যা নহে একথা মহর্ষি মনু বহুবার বলিয়াছেন। তিনি মাতার ন্যায় স্বামীর আহার দিবেন, মন্ত্রীর ন্যায় সৎ উপদেশ দিয়া স্বামীকে পরিচালিত করিবেন; দাসীর ন্যায় সেবা করিবেন, ও পীড়ার সময় চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ পথ্য দিবেন ও পীড়া উপশমের চেষ্টা করিবেন, সখীর ন্যায় চিত্ত বিনোদন করিবেন, এবং স্বামীর গচ্ছিত ধনের ন্যায় সন্তান পালন ও সুশিক্ষিত করিবেন, ভাণ্ডারীর ন্যায় অর্থ বিত্ত সঞ্চয় ও

রক্ষা করিবেন, এবং সর্ব্বদা স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইয়া এক সঙ্গে ধর্ম্ম-কার্য্য সাধন করিবেন এবং সর্ব্বদা মনে রাখিবেন স্বামীতে ও তাঁতে মিলিয়া দুই আধ্খানি একত্র করিয়া একটী পূর্ণ মানব সৃষ্টি হয়েছে। পক্ষান্তরে স্বামীও ঐ ঐ ভাবে স্ত্রীর সহিত ব্যবহার করিবেন যাহাতে স্ত্রীর মনে প্রত্যয় জন্মায় যে, পুরুষে ফাঁকি দিয়া স্ত্রীর দ্বারা ভাল ব্যবহার লইয়া নিজের বেলায় অন্যরূপ করিয়া থাকেন না; পরন্তু সেবাগুণে পরস্পরকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়া অকৃত্রিম ভালবাসার ফলস্বরূপ বংশের তিলক সুসন্তান প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকেই স্বর্গসুখ ভোগ করিতে থাকিবেন।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মহর্ষি মনু অনেক কথাই বলিয়াছেন। স্বামী স্ত্রীকে মিষ্ট কথা বলিবেন, মিষ্ট ব্যবহার করিবেন, বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া সন্তুষ্ট করিবেন, উত্তম আহার উত্তম সেব্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবেন, কদাচ ভৎর্সনা কি কটু বাক্য দ্বারা মনে বেদনা দিবেন না, সংক্ষেপতঃ যে যে ভাবে স্ত্রী স্বামীকে ব্যবহার করিবেন, স্বামীও সেই সেই ভাবে যথাসম্ভব রূপে স্ত্রীর সেবা করিবেন, ইহাই যথার্থ ভালবাসার নিদর্শন।

সংস্কৃত গ্রন্থে স্ত্রীকে স্বামী "দেবী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং স্বামীকে স্ত্রী "আর্য্যপুত্র" বলিয়া ডাকিতেন। এক্ষণে স্বামী যেন স্ত্রীকে সেই দেবী ভাবেই ব্যবহার করেন। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, "দুর্লভা সদৃশী ভার্য্যাঃ দুর্লভঃ পুত্র পণ্ডিতঃ।" অর্থাৎ এই জগতে নিজের মনোমত স্ত্রী লাভ করা বড়ই কঠিন, আবার সুশিক্ষিত জ্ঞানবান্ পুত্রও পাওয়া কঠিন। চাণক্য পণ্ডিত আবার অন্যত্র বলিয়াছেন,—মাতা যস্য গৃহে নাস্তি, ভার্য্যাচাপ্রিয়বাদিনী। অরণ্যং তেন গন্তব্যং, যথারণ্য যথাগৃহং॥ অর্থাৎ যাহার ঘরে মাতা

নাই এবং যাহার স্ত্রীও মিষ্ট কথা বলে না, সেই হতভাগার বনে যাওয়াই ভাল, কেননা তাহার পক্ষে ঘর আর বন উভয় তুল্য। অর্থাৎ যে স্ত্রী স্বামীকে মিষ্ট কথা দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে না পারেন তাঁহাকে ত্যাগ করে স্বামী অবশ্যই বনে যাবেন যেহেতু বনে হিংস্র জন্তুর সহবাসে বরং কিছু সুখ আছে—কিন্তু ঘরে নিয়ত মর্ম্মভেদী বাক্যবান।

চণ্ডীগ্রন্থে আছে, ভক্ত ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন,—"ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি চিত্তবিত্তানুসারিণীং" অর্থাৎ হে দেবি আমাকে ধনৈশ্বর্য্য ইত্যাদি সমস্তই দাও এবং সর্ব্বোপরি এমন একটী স্ত্রী দাও যিনি সর্ব্বদা আমার মনে আনন্দ প্রদান করেন ও আমার মনোমত কাজ করিতে থাকিয়া আমার তুষ্টি সম্পাদন করেন নতুবা কেবল মাত্র ধনৈশ্বর্য্য পাইলে আমার কোনই সুখ হইবে না।" কোন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন এই জগতে ভগবানের সমস্ত দানের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে সুগৃহিণী। বস্তুতঃ স্ত্রী যদি মনোমত হয় তবে সুখ শান্তির জন্য এ জগতে অবশিষ্ট আর কিছুই প্রার্থনীয় থাকে না। এক মাত্র ঐরূপ স্ত্রী হইতেই বাক্যের দ্বারা, কার্য্যের দ্বারা, সুপরামর্শের দ্বারা সমস্ত অভাব পূর্ণ হইতে পারে। যে হতভাগ্য পুরুষ, সুগৃহিণী লাভে বঞ্চিত আছে তার জীবনই বৃথা।

ব্রত পালন।

হিন্দু শাস্ত্রমতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পক্ষে কতকগুলি ব্রত পালনের বিধি আছে, এবং উহার দ্বারা অশেষ কল্যাণকর ফল লাভের কথাও বলা হয়েছে। ব্রত অর্থে নিয়ম। ব্রতপালন মানে আপনাকে নিয়মে আবদ্ধ করিয়া উপবাস আদি দ্বারা সংযম শিক্ষা করা। নিজেকে নিয়মে আবদ্ধ ক'রে মনকে সংযত ও শৃঙ্খলিত করিতে বিশেষ মনের বল ও একাগ্রতার দরকার। ধর্ম্ম জীবন লাভের এই সমস্ত সোপান। এই সমস্ত ব্রতকথায় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ভক্তি সহকারে সেই সেই ব্রত—দেবতার পূজা অর্চ্চনা করাতে মনে ভক্তির উদ্রেক হয় ও শান্তি পাওয়া যায়। বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। তুমি ভক্তি ও বিশ্বাস পূর্ব্বক যে যে ব্রত পালন পালন করিবে এবং যে যে ব্রত-দেবতার পূজা করিবে তাহাতেই তোমার আত্মার উন্নতি হইতে পারে।

তোমার শ্বাশুড়ীর পরামর্শ লইয়া দুই একটী করিয়া ক্রমে যে কয়টী ব্রত করিয়া উঠিতে পার, তাহাতেই তোমার শুভ। পাঁজিতে যে সমস্ত ব্রতের নাম উল্লেখ আছে সেই সমস্ত "ব্রত কথা" পড়িয়া যে ব্রতটী তোমার মনোমত সেইটী করিবে, আবার তাহাও যদি তোমার শ্বাশুড়ী করিতে বলেন, তবে আরো ভাল হয়; কিন্তু যাহা ধরিবে তাহা একান্ত দৃঢ়তা সহকারে অবিচলিত ভাবে করিতে থাকিবে। কোন কোন ব্রত একাধিক্রমে ১৪ বছর পর্য্যন্ত করিতে হয়। ইহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিলে ব্রত ভঙ্গ হইয়া গেল অর্থাৎ "ব্রত পচিয়া" গেল। এইরূপে নিয়ম পালন, সংযম শিক্ষা, এবং

একাগ্রতা ও কঠোরতায় অভ্যস্ত হওয়াই ব্রতের প্রধান উদ্দেশ্য। ধনৈশ্বর্য্য, পুত্র লাভ, অক্ষয় স্বর্গভোগ ইত্যাদি অনেক ফল লাভের কথা লেখা আছে। সে সমস্ত গৌণ ফল জানিবে এবং ঐ সমস্ত পাইবার আশায় প্রলুব্ধ হইয়া ব্রত করিতে যাইবে না। ব্রত করিবে "ব্রতের" জন্য,—ফল লাভের জন্য নহে ইহা মনে রাখিবে। এসব উচ্চদরের কথা সাধারণ স্ত্রীলোকে বোঝেনা কিম্বা বুঝিবার আবশ্যকও নাই। হিন্দু ধর্ম্মের সমস্ত কার্য্যই নিষ্কামভাবে করিতে হয় এবং ফল নারায়ণে সমর্পণ করিতে হয়।

যেমন আজন্ম বাঁধা ঘোড়াটী ছাড়া পাইলে, সে ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতে করিতে কত শস্যক্ষেত্র নষ্ট করে, কাহারো শিশু-সন্তান পদদলিত করে, কাহারও ঘর দুয়ার ভাঙ্গে অবশেষে এক উচ্চ বেড়া উল্লম্ফনে পার হইতে গিয়া বেড়ার গোঁজ পেটে ফুটিয়া ঘোড়াটী মারা যায়;—সেইরূপ আমাদের এই দুষ্ট মনকে সর্ব্বদা সংযমরূপ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া না রাখিলে, প্রথমে কুপরামর্শ শুনিয়া, তৎপরে কুসঙ্গে মিশিয়া অবশেষে কুকার্য্য দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে নিজের ও অপরের আধ্যাত্মিক জীবনের অশেষ অনিষ্ট সাধন করিয়া, ভগবানের কোপ আনয়ন করতঃ আজন্ম নরক-ভোগ করিতে হয়। এই হেতু ব্রত, উপবাস ও সংযমের দরকার। মনকে যদৃচ্ছা চলিতে দিলে আর রক্ষা নাই। মন একবার ছাড়া পাইয়া কুপথে চলিতে শিখিলে, আর তাকে ফিরাইয়া সুপথে আনা বড়ই কঠিন। আমরা অনেক মদ্যপায়ী ও পাপানুষ্ঠানকারীকে অনুতাপ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি,—"হায়! আর এ কু অভ্যাস ত্যাগ করা আমার সাধ্য নহে, এ জীবন এই ভাবেই শেষ হইবে—আর ভাল হ'য়ে ক'দিনই বা বাঁচিব? ইত্যাদি।"

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ অনিত্যম্ খলু জীবিতম্।
কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যু কালো ভবিষ্যতি॥
পূর্ব্ব বয়সি তৎকুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃসুখং বসেৎ।
যাবজ্জীবেন তৎকুর্য্যাৎ যেনামুত্র সুখং বসেৎ॥

অর্থাৎ জীবনের যখন কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই, তখন যুবাকালেই ধর্ম্মাচরণ করিতে হয়, কারণ কেহই বলিতে পারে না "আজ আমার মৃত্যু হইবে না"। মনু আরো বলিয়াছেন যে, যেরূপ কাজ করিলে বৃদ্ধ কালে সুখ হয় তাহাই বাল্যকালে যেমন করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ, যে কাজে পরকালে সুখ হইতে পারে সেইরূপ কাজ সারা জীবন করিতে থাকিবে।

এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। আমাদের জাতীয় জীবন ক্রমে যেরূপ হীন হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে কত যুগযুগান্তর পরে যে আমাদের উত্থান হইবে, তাহা ভগবানই জানিতেছেন; একারণ আমাদের প্রত্যেক কুমারী এবং বিবাহিতার কর্ত্তব্য হয় যে, সকলে জন্মাষ্টমী ও বীরাষ্টমী ব্রত পালন করত নিজে ভাবী বীরমাতা হইবার জন্য ভগবানের নিকট নিয়ত প্রার্থনা করিতে থাকেন। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মত কূট-রাজনীতি-বিশারদ ও শিবাজী প্রতাপ সিংহের মত বীর সন্তানের আবির্ভাব হইয়া এই দীনতাগ্রস্তা পদদলিতা ভারতমাতার দশাবিপর্য্যয় ঘটে এরূপ প্রার্থনা সকল নারীই যেন নিয়ত করিতে থাকেন। ভগবান অবশ্যই তাঁহাদের আবেদন মঞ্জুর করিবেন।

সঞ্চয়।

আমাদের নীতিশাস্ত্র মতে সমস্ত আয়ের সিকি অংশ সাংসারিক ব্যয় বাবদে, সিকি অংশ দেব সেবায়, সিকি অংশ অতিথি অভ্যাগত ও দীন দুঃখীর সাহায্য জন্য, এবং অবশিষ্ট সিকি অংশ সঞ্চয় করিবে। কিন্তু আজকাল যেরূপ দুর্মূল্যের যুগ পড়িয়াছে, তাহাতে সিকি অংশে আর সংসার চলে না। সুতরাং আয়ের অর্দ্ধেক সংসারে, সিকি, দেবসেবা ও দাতব্য কার্য্যে এবং অবশিষ্ট সিকি সঞ্চয় করিবে।

কখন্ কোন্ বিপদ আসে, কখন্ চিকিৎসা হেতু অনিবার্য্য অজানা কত টাকা ব্যয় লাগে, আবার ভবিষ্যতে এইমত আয় থাকিবে কি না, তাহার যখন কিছুই স্থিরতা নাই, তখন সঞ্চয় না করা নিতান্ত অপরিণামদর্শী মূর্খের কাজ। ভবিষ্যতের আহার জন্য যথাসম্ভব সঞ্চিত অর্থ না থাকিলে, মানুষ ভাবিয়া ভাবিয়া পাগল হয়ে যায়।

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে হইল। একদা মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস পণ্ডিতকে অন্য কোন পণ্ডিত তর্কে পরাস্ত করিতে না পারিয়া, পরাজিত পণ্ডিতগণ যুক্তি করিলেন, কাল যখন রাজ সভায় বিচার হইতে থাকিবে,তখন যেন কালিদাসের চাকর আসিয়া কালিদাসকে সংবাদ দেয় "অদ্য গৃহে তণ্ডুলং নাস্তি," অর্থাৎ আজ ঘরে চাল্ বাড়ন্ত। পরদিন যখন রাজসভায় ঘোর বিচার চলিতেছে এবং অন্য সকল পণ্ডিত কালিদাসের নিকট পরাস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময় পূর্ব্ব ষড়যন্ত্র অনুসারে কালি-

দাসের বাড়ীর চাকর আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল "মহাশয়! অদ্য গৃহে তণ্ডুলং নাস্তি।" এই কথা শুনিবামাত্র কালিদাসের মাথা ঘুরিয়া গেল এবং তিনি বিচারে সেদিন পরাস্ত হইলেন।

এই গল্পটী সত্য হউক আর মিথ্যা হউক কিছু আসে যায় না কিন্তু ইহাতে যে জ্ঞান পাইলাম তাহাই প্রণিধান যোগ্য। "সঞ্চিত অর্থ কিছু নাই" এই কথা মনে হইলেই শরীর অসাড় হয়, মন অবসন্ন হয়, নিস্তেজ হয়, উৎসাহ স্ফূর্ত্তি থাকে না, পীড়া বেশী জোরে আক্রমণ করে এবং কোন বিষয়ে সুখ শান্তি পাওয়া যায় না। কেবল দুশ্চিন্তা, অশান্তি,—যাহা মানুষকে কখনো কখনো আত্মহত্যার পথে চালিত করে থাকে। অতএব সর্ব্বতোভাবে মাসে মাসে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে হয়;—দেখিবে ১০ বছরে বেশ কিছু জমিয়াছে। তখন মনে দুনো বল হবে, উৎসাহ হবে, স্ফূর্ত্তি আসিবে এবং স্বাস্থ্য ও আনন্দ জন্মিবে, আরো পীড়াও কম হবে। তখন দীর্ঘায়ুঃ হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে পারিবে।

লোকে কথায় বলে "সঞ্চয়ী কখনই অবসন্ন হয় না।" বাস্তবিক অপব্যয়ী, ভোগবিলাসী, অসঞ্চয়ী ব্যক্তির অভাব অনটন কখনই ঘুচে না। অধিকন্তু উহার অভাব, অনাটন, পীড়া, অনাহারে যাহা না করিতে পারে তাহা একমাত্র নৈরাশ্য ও দুর্ভাবনায় করিয়া থাকে। "আমার আর কিছুই নাই আজ যদি ভিক্ষা না জোটে ত উপোস" এই রকম চিন্তা মনে নিয়ত স্থায়ী হইলে, শরীর ক্ষয় পাইয়া অচিরে জীবন শেষ ক'রে ফেলে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি এইরূপ ভাবে হতাশে মরিতে বসিয়াছে এরূপ মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে

যদি বলা যায়, "তাহার পিতা ঘরের মেজে এক ঘড়া টাকা পুঁতিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন আজ দৈবযোগে হঠাৎ তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।"—এই কথা শুনিলেই ঐ মৃতকল্প ব্যক্তি বাঁচিয়া উঠে এবং যে অবস্থা ইতঃপুর্ব্বে কোন চিকিৎসকেই করিতে পারে নাই তাহাই—অর্থপ্রাপ্তিবার্ত্তামাত্র শুনিয়াই হইল—সশরীরে চাকৃচিক্যময় রজতখণ্ড দৃষ্টিগোচর করিলে না জানি মনে কত জীবনী শক্তির আবির্ভাব হয়!

আয়ের টাকা হাতে আসিলেই তাহা হইতে হিসাব মত যথা-সম্ভব সঞ্চয় আগে পৃথক ক'রে রাখিয়া তবে ব্যয়ের কাজে হাত দেবে। কারণ ব্যয়ের কার্য্য গুলি নির্ব্বাহ করিয়া পরে উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয় করা যাবে, একথা কাজের বেলায় মোটেই খাটে না। ব্যয় করিতে করিতে সমস্তই নানা কারণে ব্যয় হইয়া যায়, তখন অবশিষ্ট আর কিছুই থাকে না। এ কারণ সকলের আগে সঞ্চয়,তার পর ব্যয়। মনে কর তুমি ৺মা লক্ষ্মীর ভোগের জন্য পায়স মিষ্টান্ন সমস্তই প্রস্তুত করিয়াছ কিন্তু পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া পূজা করিতে বিলম্ব করিতেছেন। এ দিকে তোমার অবোধ শিশু সন্তানেরা ঐ পায়স আদি খাইবার জন্য কাঁদিয়া প্রাণ বাহির করিতেছে। এমত অবস্থায় তুমি কি কর? তুমি অবশ্যই "আগ" তুলিয়া মা লক্ষ্মীর জন্য পৃথক করে উঠাইয়া রাখিয়া তার পর ছোট ছোট বাটী ক'রে ছেলে মেয়েদের খেতে দিয়ে শান্ত করে থাকো। এখন তোমার আয়ের টাকা হচ্ছে মা লক্ষ্মীর ভোগ, ঐ টাকা ঘরে আসিলেই তুমি ইচ্ছামত খরচ করিবে,—সেটী হচ্ছে না। উহা হইতে "আগ" তুলিয়া অর্থাৎ সঞ্চয়ের টাকা আগে পৃথক করে রেখে তবে ছেলে মেয়েদের জন্য, সংসারে জন্য ব্যয় করিবে।

সন্ন্যাসীর সঞ্চয় নাই। যেহেতু সন্ন্যাসী দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন দিন হয়তো কোন গাছ তলায় মরিয়া পড়িয়া রহিলেন, সে জন্য তাঁর মোটেই ভাবনা চিন্তা নাই। কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে সঞ্চয় নহিলে কোন ক্রমেই চলে না। তার স্ত্রী পুত্র, পিতা মাতা, জ্ঞাতি কুটম্ব, অতিথি অভ্যাগত, বাড়ী ঘর সন্তান পালন, বিদ্যাশিক্ষা বিবাহ ইত্যাদি সবই আছে,—এর কোনটা বাদ দেওয়া যায়? সব দিকে চিন্তা করিয়া আগে থেকে প্রস্তুত না থাকা, আর সন্ন্যাসী হওয়া একই কথা। তখন "কাকস্য পরিবেদনা" আজকার দিন কোন রূপে চলিয়া গিয়াছে, বংশ আর চাই কি? ইহাই গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন পদ্ধতি কিন্তু গৃহস্থের সেরূপ হইতে পারে না; হওয়াও উচিত নহে।

ধনৈশ্বর্য্যদাত্রী মা লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভ করত অর্থবান হওয়ার উদ্দেশ্যে মহাভারতের অনুশাসনিক পর্ব্বে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা এই :—একদা রুক্মিণীদেবী, রূপ লাবণ্য-বতী লক্ষ্মীকে নারায়ণের পার্শ্বে উপবিষ্টা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি তুমি কোন্ কোন্ স্থানে এবং কিরূপ ব্যক্তির নিকট অবস্থান করিয়া থাকো, তাহা শুনিতে আমার বড় কৌতূহল হইতেছে, অতএব দয়া করিয়া সবিশেষ বর্ণনা করত আমাকে চরিতার্থ কর"। তখন মৃদু-মধুর হাস্য করত লক্ষ্মী বলিতে লাগিলেন,—"সুন্দরি! তবে শ্রবণ কর। আমি সত্যবাদী, কার্য্যদক্ষ, ক্রোধবিহীন, দৈব-পরায়ণ, কৃতজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় ও উদারচিত্ত ব্যক্তিদের নিকট অবস্থান করিয়া থাকি। অকর্ম্মণ্য, নাস্তিক, দুশ্চরিত্র, কৃতঘ্ন, আচারভ্রষ্ট, নৃশংস, তস্কর, গুরুদ্বেষ্টা, মূঢ় স্বভাব, কপট, বলবীর্য্য-বুদ্ধিহীন, যাহাদের ক্রোধ ও হর্ষের পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই, যাহারা কিছুমাত্র

অর্থ পাইতে ইচ্ছা করে না, অথবা সামান্য মাত্র পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া চেষ্টায় বিরত হয়, আমি তাহাদের নিকট থাকি না। যাহারা স্বধর্ম্ম-নিরত, ধর্ম্মজ্ঞ, গুরুজনের সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করে, পুণ্যাত্মা, ক্ষমাশীল ও বুদ্ধিমান আমি তাহাদের নিকটে থাকি। যে নারীগণ গৃহের উপকরণগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া রাখে, কার্য্য অনুষ্ঠানকালে বিবেচনা থাকে না, যাহারা স্বামীর প্রতি কর্কশ বাক্য কর্কশ ব্যবহার করে, সর্ব্বদা পরের ঘরে ও পরের সঙ্গে থাকিতে ভালবাসে, যাহাদের ধৈর্য্য ও লজ্জা নাই, যাহারা নির্দ্দয়, অশুচি, বিরক্ত-চিত্ত, কলহপ্রিয়, ও নিদ্রাপরায়ণ আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকি। যে কামিনীগণ পতির একান্ত অনুরক্ত, ক্ষমাশীল, সত্যনিষ্ঠ, নিষ্পাপ, নির্ম্মল চরিত্র, সত্য সরলতা গুণসম্পন্ন, দেব দ্বিজে ভক্তিমতী, সৌভাগ্য ও সৌন্দর্য্যযুক্ত, আমি সতত তাহাদের নিকটেই অবস্থান করি। যে গৃহে হোম, যাগ, যজ্ঞ, পূজা, ব্রতপালন, গো ব্রাহ্মণ অর্চ্চনা, সেই গৃহে এবং প্রস্ফুটিত পদ্মবনে ও সাধু সচ্চরিত্র সুন্দরী নারীর শরীরে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকি। আমি সদয়ভাবে যাহার কাছে থাকি তাহার ধর্ম্ম, অর্থ, যশ শীঘ্রই বাড়িয়া উঠে।”

সন্তানের শিক্ষা।

নাম বলিবার দরকার নাই, আর সে ত বড় বেশী দিনের কথাও নহে, কতিপয় মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের যাহা কিছু উন্নতি হয়েছে সে সব তাঁদের মাতার সুশিক্ষার গুণে। আমিও আশা করি তোমার ছেলেরা কালে ঐরূপ মহাপুরুষ হইয়া যেন বলিতে পারে, আমরাও আমাদের মাতার সুশিক্ষা গুণে আজ এত বড় হয়েছি।

এখন কথা হচ্ছে, কেবল মাত্র সুপুষ্ট বীজ বপন করিলেই সুন্দর ফসল পাওয়া যায় না। তার জন্য উত্তম কর্ষিত উর্ব্বর ক্ষেত্র চাই, যথেষ্ট পরিমাণ রৌদ্র, বৃষ্টি, বাতাস চাই, আরো কতকগুলি আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা পাওয়া চাই, তবেই সুফসল উৎপন্ন হবে। কিন্তু তাই বলিয়া সুবীজের আবশ্যকতা সব চেয়ে বেশী, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এখানে শিশুর মন হচ্ছে উর্ব্বর ক্ষেত্র, ও মাতার উপদেশ হচ্ছে বীজ। যেমন কাঁচা মাটিতে যে জিনিস গড়ো, অনায়াসেই গড়া যায়, পরে শুকাইয়া আগুনে পোড়াইলে তাহা আর অন্য রূপ হয় না। তখন তার আকার পরিবর্ত্তন করিতে গেলে, ভাঙিয়া যাবে তবু রূপ বদলাইবে না; সেইরূপ শিশুর কোমল মন মাতা যে ছাঁচে ফেলিবেন, আজীবন তাহাই থাকিবে কদাচ তাহার পরিবর্ত্তন হইবে না। যে মাতা হরি-ভক্ত, তাঁর ছেলেও সেই দেখাদেখি আধ আধ কথায় "হরিবোল" বলিতে শেখে, এবং বড় হইলে সে একজন পাকা বৈষ্ণব হইয়া উঠে। আবার যে মাতা কালী ভক্ত তাঁর ছেলেও ক্রমে পাকা শাক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

তখন কিছুতেই সেই বৈষ্ণবকে শাক্ত এবং শাক্তকে বৈষ্ণব করা যায় না ।

সাধারণতঃ মাতারা দুরন্ত শিশুকে শান্ত করার জন্য অথবা ঘুম পাড়াইবার জন্য ছেলেকে ভূতের ভয় কি জুজুর ভয় দেখাইয়া থাকেন কিন্তু কালে ঐ শিশু বড় হইলেও ঐ ভূতে বিশ্বাস একেবারে যায় না—তবে জ্ঞানের দ্বারা কমে বটে। এখন মাতা হচ্ছে ছেলের প্রথম শিক্ষাদাত্রী আদি গুরু। এই কারণেই সব দেশের দেশীয় ভাষাকে "মাতৃভাষা" বলে। যা হোক ছেলেকে মাতার অতি সাবধানে শিক্ষা দিতে হয়। ছেলের মন যেন আর্শি। মাতার কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্ম, আলাপ ব্যবহার, সমস্তই সেই আর্শিতে প্রতিবিম্ব পড়ে এবং ফটোগ্রাফির মত স্থায়ী হয়। ছেলে পুস্তকে পড়িল "মিথ্যা কথা কহিতে নাই", স্কুলে শিক্ষক উপদেশ দিলেন "মিথ্যা কহিতে নাই", বাড়ীতে পিতার নিকট শুনিল "মিথ্যা কহিতে নাই।" কিন্তু ঐ বালকের বেশ মনে আছে সে একদিন ঔষধ খাইতে চাহে নাই। মাতা বলিলেন, "বাবা ঔষধ খাও আমার সিন্দুকে সন্দেশ আছে তার চারিটা দিব।" ছেলে তখন ঔষধ খাইল কিন্তু মা সন্দেশ দিলেন না সুতরাং ছেলে কাঁদিতে লাগিল। মা তখন সিন্দুক খুলিয়া দেখাইলেন সন্দেশ একটাও নাই। ইহাতে ছেলে শিখিল মিথ্যা বলিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে হয় এবং তাহাই উহার পাকা জ্ঞান হইল। এইরূপ সব কাজে সব কথায় ছেলে, মার কাছে শেখে এবং আজীবন মনে রাখে। সে মনে করে, মা তাহার আদর্শ। সুতরাং মাতা যেন সাবধানে ছেলের সম্মুখে কথা কন ও কাজ কর্ম্ম করেন। সাধারণতঃ মাতারা গুরুজনের সাক্ষাতে সাবধানে চলেন ও কথা কন কিন্তু সন্তানের সুমুখে যা ইচ্ছা

বলেন ও করেন। এটী তাঁহাদের বড় ভুল ; কারণ ইহাতে তাদের ভাবী জীবন একেবারেই নষ্ট করে দেওয়া হয়। আমাদের জাতীয় জীবন যে এত হীন, তার প্রধান কারণ হচ্ছে সু মাতা ও সুশিক্ষার অভাব। আমি যত প্রসিদ্ধ লোকের জীবন চরিত পড়িয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মাতা অতি বুদ্ধিমতী ও গুণবতী ছিলেন।

যে সমস্ত বাড়ীতে আমার গতি বিধি আছে, যেথানকার সমস্ত ঘটনা যথার্থ রূপে জানার পক্ষে আমার কিছুমাত্র বাধা হয় নাই, এরূপ বহু আত্মীয় পরিবার মধ্যে আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, শিশুদের কথা ফুটিলে অবধি পিতা, পিতৃব্য প্রভৃতির দ্বারা সুশিক্ষা ও জ্ঞান উপদেশ পাইয়াও, তাহাতে কিছুমাত্র সুফল হয় নাই, কেবল উহাদের মাতার জ্ঞান ও সুবুদ্ধির অভাবে। আমি ঐ সমস্ত পরিবারে প্রত্যক্ষ করিয়াছি বালক, বালিকারা যথার্থ দোষের জন্য পিতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত এবং শাসিত হইলে তখনি তাহাদের মাতা আসিয়া উপস্থিত হইয়া শাসনকারী নিজ স্বামীকে চীৎকার করিয়া বলিতেন ;—"তুমি এরূপ অন্যায় ক'রে বাছাদের শাসন করিতেছ কেন? উহারা তোমার চক্ষুশূল হয়েছে, উহারা মরে গেলেই তোমায় শান্তি হইবে। যে দোষের জন্য উহাদের এত তিরস্কার ও শাসন করিতেছ তাহা অতি সামান্য দোষ, যাহা বাল্যকালে তুমিও করিয়াছ। আমি বেশ জানি উহাদের কাকারা এবং পিশিরা কত বড় বড় দোষ করিতেন কিন্তু শ্বশুর ঠাকুর কি শাশুড়ী ঠাকুরাণী কিছুই বলিতেন না, "ইত্যাদি ইত্যাদি" মাতার মুখে এই কথা শুনিয়া ছেলেরা কাকা পিশিদেরকৃত সেই "বড় বড়" দোষ করিতে আরম্ভ করিল এবং পিতাকে শত্রু জ্ঞান করিল। আর মাতা,—যিনি উহাদের দোষের প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন

তাঁহাকে তাহাদের পরমহিতৈষী জ্ঞান করিয়া পিতৃপ্রদত্ত সমুদয় উপদেশ শীঘ্রই ভুলিয়া গিয়া ক্রমে এক একটী নরপিশাচ হইয়া দাঁড়াইল। অতএব আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি (কমলাকে লক্ষ্য করে বলা হইতেছে) সর্ব্বপ্রযত্নে সুমাতা ও সুগৃহিনী হইতে চেষ্টা করিবে ; যে দুইটী গুণ গৃহিণীতে না থাকিলে সে সংসার নরক তুল্য হয় যাহা আমি বহুস্থানে বহু সংসারে দেখিয়াছি। তাই বলিতেছি, ছেলের ভবিষ্যৎ উন্নতি অবনতি সব মাতার হাতে। শোন নাই কি ভুবনের মাসী হয়েছিল তার ফাঁসীর কারণ—ভুবনের মা ছিলনা তাই মাসী তাহাকে লালন পালন করিয়া প্রকৃত পক্ষে "মা" হয়েছিল।

অনেক পিতামাতা মনে করেন ছেলেকে স্কুলে দিয়েছি, আর চিন্তা নাই ছেলে শীঘ্রই বিদ্বান্ ও জ্ঞানী হয়ে আসিবে। এটী তাঁহাদেয় বিষম ভুল। স্কুলে বরং কুসঙ্গে মিশিয়া ছেলে অনেক "কু" শিখে আসে ; তাই পিতামাতার কর্ত্তব্য রোজ রোজ তার মন পরীক্ষা করা এবং জানা, যে কোনদিকে ছেলের মনের দৌড়। সুনীতি না শিখিলে অনেক বড় বড় বিদ্যার জাহাজ সংসার সমুদ্রে "বান্চাল" হয়ে যায়। তখন সেই বিদ্যাই তার কুপথের প্রধান সহায় হয়। তার চেয়ে সুনীতি পরায়ণ মূর্খ ছেলে মা বাপের ভক্তি করে, সেবা করে এবং খাইতে দেয়, আর কটু বলেনা কিম্বা গালি দেয়না অথবা মারিতেও যায় না।

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে লোকে কত আনন্দ ক'রে থাকে কিন্তু প্রতিবেশী কাহারো ছেলে হওয়ার কথা শুনিলে আমার মনে যেন আতঙ্ক উপস্থিত হয়,—কি জানি এই ছেলে বড় হ'য়ে চোর হয় কি ডাকাত হয়, কি নরঘাতক হয়, কি পিতৃহন্তা হয় তাহা কে

বলিতে পারে? নিতান্ত পূর্ব্বজন্মের বহু পুণ্য না থাকিলে সুসন্তান লাভের সৌভাগ্য হয় না,—বেশীর ভাগ বলিতে গেলে,ছেলে কুলাঙ্গার, পাষণ্ড, নরাধম ও পামর। এই দেখনা কেন এই বাঙ্গলা দেশে ৫ কোটি লোকের মধ্যে আন্দাজ তিন কোটি পুরুষ বাস করে অর্থাৎ বুঝিতে হইবে কয়েক বছর পূর্ব্ব হইতে ক্রমে এই বাংলা দেশে তিন কোটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল যারা এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে মানুষ হয়েছে। আচ্ছা, এই তিন কোটির মধ্যে অন্ততঃ ৩ গণ্ডা কুলপাবন, ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, সুনীতিপরায়ণ, ভক্তিমান্ সুপুত্র বাহির করিতে পার কি?—কখনই না। তার কারণ সুপুত্র লাভ পরম সৌভাগ্যের কথা। সুক্ষেত্র পাইল ত সুবীজ পড়িল না, সুবীজ পড়িল ত উপযুক্ত রৌদ্র বৃষ্টি বাতাস মিলিল না। এইরূপ আনুষঙ্গিক, পারিপার্শ্বিক, সুযোগ, যাহা ছেলে মানুষ হওয়ার পক্ষে একান্ত দরকার, তাহাদের একযোগে মিলিত হওয়া অতিবড় সৌভাগ্যের কথা। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় কিম্বা ৺গুরুদাস বন্দ্যোর পিতা মাতার মত ভাগ্যবান পিতা মাতা কয়জন আছেন? অধিকাংশ পিতামাতাই দুর্ভাগ্য বশতঃ সুপুত্র লাভে বঞ্চিত আছেন। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, "শৈলে শৈলে ন মানিক্যং, মৌক্তিকংন গজে গজে। সাধবঃ ন হি সর্ব্বত্র, চন্দনং ন বনে বনে।" অর্থাৎ সব পাহাড়ে মাণিক থাকে না আবার সব হাতীর মাথায় মুক্ত পাওয়া যায় না। সব বনে চন্দন নাই, সব যায়গায় সাধু থাকেন না। এই সব বড়ই দুষ্প্রাপ্য।

এই জন্য তোমাকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক ক'রে দিতেছি, ছেলেকে মানুষ করা অতি কঠিন কাজ; সর্ব্বদা যেমন মুখে সৎ উপদেশ দিতে হয়, তেমনি সৎ দৃষ্টান্ত, কার্য্য দ্বারা দেখাইতে হয়, তবেই ছেলের

মনে সেইটী ধারণা হবে। সে আর সেটী ভুলিবেনা। "মদ খাওয়া বড় পাপ" এই কথা পিতা যতই কেন দিব্য গালিয়া, গঙ্গাজল ছুঁইয়া বলুন না, ছেলে যখন সন্ধ্যার পর তাঁহাকে তাহা খাইতে দেখে. তখন সে নিশ্চিত কিছুকাল পরে, প্রথম প্রথম গোপনে, পরে প্রকাশ্যে মদ খাইবেই। তুমি আরো দৃষ্টি রাখিবে ছেলে যেন কুসঙ্গে না মেশে কিম্বা কোন কুপুস্তক না পড়ে। এই গুলি ছেলের পক্ষে ভয়ানক বিষ। এই সংক্রামক বিষ ছেলের শরীরে প্রবেশ করিলে ছেলেটী জন্মের মত নষ্ট হইল জানিবে।

ছেলেকে মহাপুরুষ জীবনী পড়িতে দিতে হয়; তাহারা যতদিন নিজে পড়িতে না পারে কিম্বা পড়িয়া বুঝিতে পারে না, ততদিন তাদের কাছে গল্পচ্ছলে মহাজনচরিত কথা শুনাইতে হয়, যেন তাহারা বাল্যকাল হইতেই ঐ সব কথায় বিভোর হয়। তখন তাহারা শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে সর্ব্বদাই মহাপুরুষ চরিত কথায় তন্ময় হয়ে থাকিবে। তাহারা তখন ভাবিবে ঐ সব মহাজনেরা এত ছোট অবস্থা থেকে এতবড় হয়েছিলেন, তবে আমরাও চেষ্টা করিলে অবশ্যই ঐরূপ করিতে পারিব। তাঁহারা এত দুঃখ কষ্ট সয়ে শেষে বড় হয়েছিলেন অতএব আমারাও অবশ্যই পারিব। এই হেতু ছেলেকে গল্প বলিবার জন্য মাতাকে অনেক জীবন চরিত নিজে পড়িতে হয়। তাদের কাছে দুয়ো সুয়ো দুই রাণীর রূপকথা, অথবা টুনটুনির কাহিনী না কহিয়া ঐ সব মহাপুরুষ জীবন-চরিত ছেলেদের হৃদয়ে অঙ্কিত করে দিতে হয়। কদাচ মন্দলোকের চরিত কথা কি কুদৃষ্টান্তসূচক গল্প বলিতে নাই।

আমার জানা আছে একটী ছেলে ডিটেক্‌টিভের গল্পের বই পড়িতে বড় ভাল বাসিত। কিছু দিন পরে শুনিলাম ঐ বালক

সেয়ানা হইয়া কলিকাতায় বড় ডাকঘরে চাকরি করিতেছে। আবার আর কিছুদিন পরে শুনিলাম, রেজেষ্ট্রী চিঠী হইতে হাজার টাকার নোট চুরি করাতে ধরা পড়িয়া, সে পাঁচ বছরের জন্য জেলে গিয়াছে। আমাদের দেশের একটী বড় লোকের ছেলে, যাহাকে আমি বাল্যকাল হইতে বিশেষরূপ জানিতাম; সে রবার্ট ম্যাকেয়ার নামক বিলাতি ডাকাতের গল্পের বই পড়িতে ভাল বাসিত। সে কিছুকাল পরে বাপের লোহার সিন্দুকের চাবি খুলিয়া দুই হাজার টাকা চুরি করিয়া আনিয়া কলিকাতায় অনেক দুষ্কার্য্য করেছিল। তারপরে আরো কয়েকবার ঐ ভাবে টাকা চুরি করাতে তার বাপ তাঁহাকে ত্যজ্যপুত্র করে বাড়ী হ'তে তাড়াইয়া দিয়েছিলেন। সে এখন ভিক্ষা করে খাইয়া দিন কাটাইতেছে। কুসঙ্গ ও মন্দ পুস্তক পাঠের দোষের কথা ভাল করে বুঝাইবার জন্য এই সত্য ঘটনা দুইটীর উল্লেখ করা গেল।

যে প্রতিজ্ঞা নিজে তুমি পূরণ করিতে পারিবে না কিম্বা পূরণ করার ইচ্ছা মনে মনে নাই, এমন প্রতিজ্ঞা ছেলের সুমুখে করিবে না। যাহা তাহাকে দিবে না, কিম্বা দিবার ইচ্ছা মনে মনে নাই কিম্বা যাহা দেওয়া অসম্ভব, এরূপ বস্তু "দিব" বলিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিও না। তোমার বাক্যের দ্বারা এবং কার্য্যের দ্বারা বুঝিতে দিও যে তোমার মনে মুখে এক। যাহা দেবেনা তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিও। কদাচ বৃথা আশা দিয়া নিরাশ করিও না। ছেলের কাছে কপটতা করিও না। ছেলেকে ভৎ´সনা বা তিরস্কার করিও না। কোন দোষ করিয়া থাকিলে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া দিও, দেখিবে সে আর তাহা করিবে না। ছেলেকে নিজ প্রতিজ্ঞা দৃঢ়পালনে তা বজায় রাখিতে শিখাইও। সে কোনো সময়ে নিজ-

কৃত-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া থাকিলে, তার "সত্যভঙ্গ" জনিত পাপ হইয়াছে বলিয়া বুঝাইয়া দিবে।

খাবার দিবার সময় সব ছেলেকে সমান ভাবে ভাগ করে দেবে; ইতর বিশেষ করিবে না। বেশী পাইবার জন্য কোন ছেলে আব্দার করিলে, কদাচ তাহা রক্ষা করিবে না। তাহাকে বুঝিয়ে দিও যে ন্যায় বিচারের ব্যতিক্রম করিলে তোমার পাপ হইবে। ইহা শুনিলে সে আর বেশী চাইবে না। পীড়ার সময় যাহা দেওয়া উচিত নহে তাহা পাইবার জন্য ছেলে আব্দার করিলে অনেক মাতা ছেলেকে সান্ত্বনা করার জন্য "খুব একটুখানি" দিয়া থাকেন। তুমি সেরূপ করিবে না। যাহা অন্যায় তার একটুও অন্যায় বেশীও অন্যায়। এরূপ করিলে ছেলে অন্যায় করিতে শিক্ষা পাবে।

গুরুজনকে ভক্তি করিতে বিশেষ ভাবে শেখাবে। আমি অনেক স্থলে দেখিয়াছি ছেলেদের মধ্যে বিনয়, নম্রতা, ভক্তিভাব একেবারেই নাই। আজকাল বাংলাদেশ যেন ভক্তিবৃত্তিটা একেবারেই লোপ পেয়েছে। দেবদেবীতে ভক্তি, গুরুজনে ভক্তি, শিক্ষকে ভক্তি—এ সব যেন আজকাল কুসংস্কার মধ্যে পরিগণিত হইয়া ত্যজ্য হতে যাইতেছে। এসব বড় অমঙ্গলের লক্ষণ। গুরুজনকে ভক্তি শ্রদ্ধা না করিলে তাঁহাদের তাতে মোটেই ক্ষতি নাই কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষতি নিজের, যেহেতু স্বভাব উদ্ধত ও রূঢ় হইয়া লোক সমাজে বিরক্তিকর ও শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে উঠি আরো গুরুজনের আশীর্ব্বাদ যাহা নিজ ভাবী মঙ্গলের হেতু তাহা হইতে একেবারেই বঞ্চিত থাকি। ভাই বোন্, দাস, দাসী, সবাইকে প্রীতি করিতে এবং সকলের সঙ্গে মিষ্ট কথা কহিতে, মিষ্ট ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেবে। "ভগবান্ আমাদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতে-

ছেন, তাঁকে ভক্তিভাবে ডাকিলে সকল অমঙ্গল দূর হয়।” বালকের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দেবে ভগবানের অগোচর কোন পাপ থাকে না সুতরাং পাপ কাজ গোপনে করিলেও ভগবান তাহা জানিতে পারেন এবং পাপের শাস্তি দেন এই কথা বালকের মনে অঙ্কিত করে দেবে। ইহাতে তার মনে পাপে ভয় হবে। আর তাকে বুঝাইয়া দেবে ভগবান্ রাত্রি দিন, সম্পদে বিপদে, আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি অসহায়ের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ও অনাথের নাথ। তিনিই একমাত্র বিপদে উদ্ধারকর্ত্তা কিন্তু তিনি পাপীর দণ্ডদাতা ও পুণ্যবানের মঙ্গলকর্ত্তা। তিনি ভক্তের ভয়হারী ও একমাত্র আশ্রয়। আমাদের অন্য কোন ভয়ের কারণ নাই যেহেতু ভগবান সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। এস, আমরা সকলে তাঁহাকে একান্ত ভক্তিভাবে নমস্কার করি; ও এই স্তোত্রগুলি সকলে একসঙ্গে মিলিতকণ্ঠে পাঠ করি ঃ—

জয় ভগবান, সর্ব্বশক্তিমান, জয় জয় ভবপতি।
করি প্রণিপাত, এই কর নাথ, তোমাতেই থাকে মতি॥
অখিল সংসার, রচনা তোমার, যে দিকে ফিরাই আঁখি।
অতি অপরূপ, হেরে তব রূপ, বিমোহিত হয়ে থাকি॥
আকাশ সাগর, গহন শিখর, দৃষ্টি করি আমি যাহে।
হেন জ্ঞান হয়, ওহে দয়াময়, বিরাজিত তুমি তাহে।
পৃথিবী সলিল, অনল অনিল, রবি শশী গ্রহ তারা।
নিয়ম তোমার, করিয়া প্রচার পরিচয় দেয় তারা॥
শাখি-শাখা যত, ফলভরে নত, চরণে প্রণত তারা।
পল্লব নড়িছে, সলিল পড়িছে, দরদর প্রেম ধারা॥

যে পেয়েছে আঁখি, দেখিতে কি বাকি, কিছু আর তার আছে।
মহিমা তোমার, প্রকট প্রচার, সদা রয় তার কাছে॥
ওহে ভবধব, কি করিব স্তব, মানস তিমির হয়।
অজ্ঞান নাশিয়া, তত্ত্বজ্ঞান দিয়া, আমারে কৃতার্থ কর॥

★ ★ ★ ★

দয়ার সাগর, সর্ব্বগুণাকর, যিনি অখিলের স্বামী।
যাঁহার কৃপায়, জীব সমুদয়, জন্মমৃত্যু অনুগামী॥
যাঁর কৃপাবলে, গ্রহগণ চলে, রবি শশী দেয় কর।
জীবের জীবন, রাখিতে পবন, সঞ্চারিছে নিরন্তর॥
যাঁর অনুমতি-ক্রমে বসুমতী, জীবগণে ধরি বুকে।
জননীর মত, স্নেহে অবিরত, আহার দিতেছে সুখে॥
পালাক্রমে ছয়, ঋতুর উদয়, আজ্ঞায় অবনী পরে।
পদার্থ সকল, যাঁহার কৌশল, অবিরল ব্যক্ত করে॥
ন্যায়বান ভূপ, যাঁহার স্বরূপ, কেবা কোথা আছে আর।
নিয়ম-নিচয়, মঙ্গল আলয়, সব সুখ মূলাধার॥

স্তোত্রমালা।

(লেথকের মন্তব্য,—আমি আশা করি নিম্নলিখিত স্তোত্র গুলি আমার কন্যা, বধূ এবং অন্য আত্মীয়াগণ প্রথমে নিজেবা মুথস্থ ক'রে তারপর সন্তানগণকে শিক্ষা দিবেন। এগুলির বাংলা অনুবাদ দিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায় বলিয়া ক্ষান্ত থাকিলাম। কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেব নিকট এগুলির অর্থ বুঝিয়া লইলে হইতে পারিবে। ইতি)

নমো নমস্তে ভগবন্ দীনানাং শবণং প্রভো !
নমস্তে করুণাসিন্ধো ! নমস্তে মোক্ষদায়ক ॥ ১ ॥
পিতা পাতা পরিত্রাতা, ত্বমেকং শরণং সুহৃৎ
গতি মুক্তি পরা সম্পৎ ত্বমেব জগতাং পতি ॥ ২ ॥
পাপ-গ্রাহ সমাকীর্ণে মোহ-নীহার সংবৃতে।
ভবাব্ধৌ দুস্তরে নাথ ! নৌরেকা ভবতঃ কৃপা ॥ ৩ ॥
তৎকৃপা তরণীং দেহি, দেহি নাথ বরাভয়ং।
মৃত্যু মায়াময়ে ঘোরে সংসারে দেহিমে অমৃতং ॥ ৪ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতু শান্তাত্মা ভক্তস্তে ভক্তবৎসল !
নির্ব্বাণং যাতু পাপাগ্নিস্তৎ প্রসাদাৎ পরেশ্বর ॥ ৫ ॥

*   *   *   *

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায় ॥
নমো অদ্বৈত তত্ত্বায় মুক্তি প্রদায়।
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥ ১ ॥

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং।
ত্বমেকং জগৎ-কারণং বিশ্বরূপং॥
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্তৃ।
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং॥ ২॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং।
গতিঃ প্রাণীনাং পাবনং পাবনানাং॥
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং।
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥ ৩॥
পরেশ প্রভো! সর্ব্বরূপ বিনাশিন্।
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য॥
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ত তত্ত্ব।
জগদ্ ভাবকাধীশ পায়াদপায়াৎ॥ ৪॥
ত্বদেকং স্মরাম ত্বদেকং ভজাম।
ত্বদেকং জগৎ সাক্ষীরূপং নমাম॥
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং।
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজাম॥ ৫॥

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং।
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং॥
পতিং পতিনাং পরমং পরস্তাৎ।
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥ ১॥
ত্বমাদিদেব পুরুষঃ পুরাণঃ।
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং॥

বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরং চ ধাম।
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপঃ ॥ ২ ॥
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য।
ত্বমস্য পূজ্যস্য গুরুর্গরীয়ান্ ॥
নতৎ সমস্ত্যভ্যধিক কুতোন্য।
লোকত্রয়োপ্য প্রতিম প্রভাবঃ ॥ ৩ ॥
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং।
প্রসাদয়েত্বামহমীশমীড্যং ॥
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ।
প্রিয় প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪ ॥
ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব।
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব ॥
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব।
ত্বমেব সর্ব্ব মম দেবদেব ॥ ৫ ॥
বায়ুর্যমোগ্নি র্বরুণ শশাঙ্কঃ।
প্রজাপতিস্তং প্রপিতামহশ্চ ॥
নমো নমোস্তেস্ত সহস্রকৃত্বঃ।
পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমোস্তে ॥ ৬ ॥

* * * *

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান, প্রণাম।

ফুল্লেন্দীবর কান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসং প্রিয়ম্।
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তভ-ধরং পীতাম্বরং সুন্দরং ॥
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিত তনুং গো গোপসঙ্ঘাবৃতং।
গোবিন্দং কলবেণু-বাদন-পরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥ ১ ॥

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ২ ॥
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপাল গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোস্তুতে ॥ ৩ ॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ৪ ॥
হরে মুরারে মধুকৈটভহারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥ ৫ ॥

* * * *

সরস্বতীর ধ্যান, প্রণাম।

তরুণ সকল মিন্দো-বিভ্রতি শুভ্র কান্তিঃ।
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষন্না সিতাব্জে ॥
নিজ কর কমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রী।
সকল বিভব সিদ্ধৈ পাতু বাগ্ দেবতা নমঃ ॥ ১ ॥
বেদাশাস্ত্রানি সর্ব্বানি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ ॥
লক্ষ্মীর্মেধা ধরাপুষ্টি গৌরী তুষ্টিঃ প্রভাধৃতি।
এতাভি পাহি তনুভিরষ্টা ভির্মাং সরস্বতি ॥ ২ ॥
যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোক পিতামহঃ।
ত্বাং পরিত্যজ্য সন্তিষ্ঠেৎ তথাভব বরপ্রদা ॥ ৩ ॥
সরস্বতি! মহাভাগে বিদ্যে কমল লোচনে!
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোস্তুতে ॥ ৪ ॥
সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্য এবচ ॥ ৫ ॥

লক্ষ্মীর ধ্যান, প্রণাম।

পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ স্বণিভির্য্যাম্য সৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনাস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রীয়ং ত্রৈলোক্য মাতরং॥
গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতাং।
রৌক্মপদ্ম ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥ ১॥
বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহিমাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোস্তুতে॥ ২॥
নমস্তে সর্ব্ব ভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যাগতিঃ ত্বৎপ্রপন্নানাং সামে ভূয়াৎ তদর্চ্চনাৎ॥ ৩॥

* * * *

শ্রীরামচন্দ্রের প্রণাম।

রামং লক্ষণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং॥
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তিমূর্ত্তিম্।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং॥

* * * *

শ্রীদুর্গার প্রণাম।

সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোস্তুতে॥

ভগবানে আত্মসমর্পণ।

স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিতেন, তাঁদের দেশে ছেলেদের মধ্যে কপাটী খেলার মত একরকম খেলা আছে, তাতে একটা ছেলে "বুড়ী" হয়ে খেলার মাঝখানে বসে থাকে, এবং অন্য সব ছেলেরা তার চারিপাশে ছুটাছুটি করে, মারধর করে, "মরা বাঁচা" হয়। কিন্তু যে ছেলেটী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া "বুড়ীকে" ছুঁয়ে দাঁড়াতে পারে তাকে কেউ মারিতে পারে না এবং সে কথনো "মরা" হয় না। আবার মহাত্মা তুলসীদাস বলেছেন যেমন জাঁতা ঘুরাইয়া কড়াই ভাঙার সময় অন্য সব কড়াইগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয়, কিন্তু যে কড়াইটী জাঁতার খিলের গায়ে লেগে থাকে সেইটী অটুট থাকে। উক্ত দৃষ্টান্ত দুইটীর দ্বারা এই দেখানো হইতেছে যে, ভগবান্ যেন সেই "বুড়ী" অথবা জাঁতার খিল। যতক্ষণ আমরা ভগবানকে ভুলিয়া বাহিরে বাহিরে থাকি, ততক্ষণ জন্ম, মৃত্যু, আপদ, বিপদ, সব ভোগ করি, কিন্তু যেই তাঁহাকে ধ'রে আত্মনির্ভর করিতে পারিলাম অমনি কোন কিছুরই ভয় রহিল না। আবার এই সংসাররূপ জাঁতার আশে পাশে যতক্ষণ আমরা থাকি, ততক্ষণ কেবল জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকি। কিন্তু যেই ভগবানরূপ জাঁতার খিল ধরি অমনি সব জ্বালা যন্ত্রণা ফুরায় ও শান্তি পাই।

যখন এই সংসারের আপদ, বিপদ, দুঃখ কষ্ট, জ্বালা যন্ত্রণা, জন্ম মৃত্যু নিয়ত আসিতেছে ও নিশ্চয় আসিবে তাহা জানিতেছি, তখন তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভের একমাত্র উপায় যে ভগবান, তাঁহার আশ্রয় লইয়া, তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিনা কেন? তিনিই

একমাত্র অবলম্বন, তিনিই একমাত্র শরণ, এই দৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়া, অন্য সমস্ত ঐহিক সুখ-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা জানিয়া ত্যাগ করত, তাঁহাকেই ধরিয়া থাকিনা কেন? আমরা অতি মূর্খ, তাই সংসারের এই মোহ কাটাইবার শক্তি সামর্থ্য নাই। কিন্তু "নাই" বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। মহাজনেরা যে উপায় অবলম্বন করিয়া, যে পথ ধরিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, আমরাও একাগ্রতা, ভক্তি, বিশ্বাস সহকারে চেষ্টা করিলে অবশ্যই ভগবানের আশ্রয় লাভ করিয়া সুখী হইতে পারিব। তখনই, কেবল তখনই,—তার পূর্ব্বে নহে—শোক, তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা সব দূরে পালাবে। আইস, আমরা সেই 'বুড়ী" ছুঁয়ে দাঁড়াই, সেই খিল ধরিয়া থাকি। ইহাকেই বলে ভগবানে আত্মসমর্পণ।

ভগবানে একান্ত ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে তাঁহার উপর আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে তিনি কখনই উপেক্ষা করে ত্যাগ করেন না। তিনি ভক্তের ও ভক্ত তাঁহারই একথা তিনি বেশ জানেন। প্রহ্লাদ তাঁর উপর একান্ত নির্ভর করেছিল ব'লে, জলে, আগুনে, বিষে, হস্তিপদতলে কিছুতেই তার পিতা রাজা হিরণ্যকশিপু তাকে মারিতে পারিলেন না। আবার ধ্রুবও ঐরূপ পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণকে দৃঢ় ভক্তি ক'রে, বনে বনে তপস্যাকালে সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তু তাহার কোন অনিষ্ট করিল না; অবশেষে ভগবান স্বয়ং আসিয়া এই দুই বালক-ভক্তকে কোলে করিলেন। তাঁহার উপর আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিলে, যদি তিনি বুঝিতে পারেন, যে ঐ ভক্তের তাঁহা ভিন্ন অন্যগতি নাই, তবে তিনি কি নিগূঢ় উপায়ে তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তাহা কেবল তিনিই

জানেন। এইরূপ ভাবে ভক্তের রক্ষা পাওয়ার কথা মহাভারতে শত সহস্র স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্য হইতে সাধারণের বিশেষ জ্ঞাত ঘটনা দুইটী এখানে উল্লেখ করা গেল। মদগর্ব্বে-গর্ব্বিত পামর দুঃশাসন কর্ত্তৃক সভামধ্যে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করার সময়ে, ঐ লজ্জাশীলা, ভীতা, রমণী কি ভাবে ভগবানের সাহায্য ভিক্ষা করিয়া রোদন করিতেছিলেন তাহা মহাভারতের সভাপর্ব্বে পড়িয়া দেখিবে। অবশেষে ভক্তের সেই কাতর বিলাপ-ধ্বনি ভগবানের কাণে পৌছিল এবং তিনি অবিলম্বে ঐ বিপদের প্রতিকারচ্ছলে অনন্তদীর্ঘ বস্ত্র সংযোজনা করিলেন সুতরাং বস্ত্রাকর্ষণকারীর পরাজয় হইল। অন্যত্র বন পর্ব্বে লিখিত আছে, যুধিষ্ঠিরাদি কাম্যকবনে বাসকালে দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় দশহাজার শিষ্য সমভিব্যহারে ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ দুর্ব্বাসা মুনি আসিয়া তথায় অতিথি হইলেন এবং অবিলম্বে সকলকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইতে না পারিলে, পাণ্ডবগণকে অভিশাপের দ্বারা ভস্মসাৎ করিবেন এই ভয় দেখাইয়া সকলে স্নান করিতে গেলেন। তখন সেই বিপদে কি করা কর্ত্তব্য বুঝিতে না পারিয়া ভয়বিহ্বল পাণ্ডবগণ, "দ্রৌপদীর ভগবৎ-ভক্তিই একমাত্র রক্ষা করিতে সক্ষম" ভাবিয়া কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন। দ্রৌপদী, আবার সেই অবিচলিত ভক্তি-সহকারে ভগবানের কাছে নিজেদের উপস্থিত বিপদের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। তখন ভগবান্ কোনো নিগূঢ় উপায়ে আপনার অসীম ক্ষমতা পরিচালন করাতে সশিষ্যদুর্ব্বাসামুনি স্নান করিতে করিতে নিজ নিজ উদর আকণ্ঠ-পরিপূর্ণ অনুভব করিয়া সত্বর গঙ্গাপারে পলায়ন করিলেন; সুতরাং অভিশাপ দ্বারা ভস্মসাৎ করিবার জন্য

পাণ্ডবকুটীরে ফিরিয়া যাইবার আর সাহস হইল না। ভগবান্ এইরূপে ভক্তগণকে রক্ষা করিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব সময়ে নবদ্বীপক্ষেত্র, মুসলমান নবাবের অধীন ছিল এবং তথায় মুসলমান কাজীগণ অবিচার করিয়া তথাকার হিন্দু অধিবাসীগণকে নানাছলে নির্য্যাতন করিতেন। ঐ সব অত্যাচার শ্রীচৈতন্যদেবের হরিসংকীর্ত্তনে শত গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের হৃদয়ে দৃঢ়া হরি-ভক্তি থাকায়, মুসলমানেরা তাঁহাকে এবং তাঁহার শিষ্য-গণকে শূলে চড়াইতে ত পারিলেন না, অধিকন্তু কাজি নিজে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। একাগ্রতা ভক্তি বিশ্বাসের জয় জয়কার হইল।

এস্থলে একটা গল্প বলিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। বিশ্বাসে দ্বিধা অর্থাৎ দুই মন অথবা সংশয় করিতে নাই। শালগ্রাম শিলাকে একান্ত ভক্তি-বিশ্বাস সহকারে দেবতা জ্ঞান করিলে তিনি দেবতা, নতুবা তিনি নোড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। একদা এক হরিভক্ত পরম বৈষ্ণব, পরমহংস হরিনাম করিতে করিতে জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া নদী পার হইলেন দেখিয়া একটী লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয় আমরা নৌকা ভিন্ন নদী পার হইতে পারি না, আর আপনি অনায়াসে হাঁটিয়া পার হইলেন। ইহা কিরূপে করিলেন, তাহা দয়া করিয়া আমাকে না বলিলে আমি আপনাকে ছাড়িব না। ইহাতে সেই মহাপুরুষ উত্তর করিলেন :— "আমি একান্ত বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে মুখে হরিনাম করিতে করিতে পার হইলাম, যাহা তোমরা স্বচক্ষে এই মাত্র দেখিতে পাইলে। এখন, সেই ভাবে চেষ্টা করিলে তুমিও পারিবে। এই

কথা শুনিয়া সেই লোকটী হাঁটিয়া নদী পার হইতে গেল। কিন্তু তার ত তেমন অবিচলিত বিশ্বাস ও দৃঢ়া-ভক্তি নাই। সে হাঁটু জলে নামিয়া যখন দেখিল কাপড় ভিজিবার উপক্রম হইয়াছে তখন আরো জোরে চীৎকার ক'রে হরি বলিতে লাগিল, এদিকে তাড়াতাড়ি হাঁটুর কাপড় গুটাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সেই মহাপুরুষ চীৎকার করিয়া বলিলেন—"ওগো! থামো থামো, তোমা-দ্বারা এ কার্য্য হইবে না। তোমার সেই অটল বিশ্বাস কৈ, সেই অচলা ভক্তি কৈ? তুমি হরিও বলিবে, আবার কাপড়ও তুলিবে! এরূপ সংশয়চিত্ত লোকের উপর ভগবানের কৃপা হয় না।"

* * * *

১ম গীত ;—রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

আমার গতি কি হবে, যদি পাতকী বলিয়া ত্যজিবে তবে
পাপের সন্তাপে পুড়িতেছে প্রাণ.
কোথা শান্তি দাতা, কর শান্তি দান,
আর এ যাতনা, সহে না সহে না, অনাথ শরণ হে॥
(ওহে,) তোমার হাতে করি আত্ম-সমর্পণ,
রাখো আর মারো যা ইচ্ছা এখন,
আমি কার কাছে দাঁড়াবো,
কোথা আর কাঁদিব, শূন্য দেখি ত্রিভুবন॥
দাও দাও দণ্ড তোমার বিচারে যে হয়,
খণ্ড খণ্ড কর এ পাপ হৃদয়,
তোমার হাতে ম'লে এ মহাপাতকী, নব জীবন পাবে॥

* * * *

২নং গীত ;—রাগিণী পিলু—তাল ঝাঁপতাল।

যথন যেরূপে বিভু রাখিবে আমারে,
সেই সুমঙ্গল, যেন না ভুলি তোমারে॥
বিভূতিভূষণ কিম্বা রতন মণি কাঞ্চন,
তরুমূলে বাস, কিম্বার াজ-সিংহাসন॥
সম্পদে, বিপদে, অরণ্যে বা জনপদে,
মান অপমান, কিম্বা রিপু-কারাগারে ;
অচল শিথরে, গভীর সাগরে,
নীরোগ শরীরে, কিম্বা রোগের-বিকারে॥
সদা বনবাসে, ভোজনে বা উপবাসে,
হিংসকের ত্রাসে কিম্বা অরির প্রহারে॥
মাণিক মন্দিরে, তৃণের কুটীরে,
শীতের তাড়নে, কিম্বা নিশার শিশিরে,
ও চরণ কমল হেরি হৃদি-সরোবরে॥
যেন না ভুলি তোমারে॥

হর্ষ ও বিষাদ।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন—"হে অর্জ্জুন! তুমি নিষ্কাম ধর্ম্ম পালন কর" অর্থাৎ তুমি ফলের আশা না করিয়া কেবল "কর্ত্তব্য" বলিয়া কর্ম্ম করিবে;—ফলের দিকে আদৌ নজর রাখিও না। ফল ভাল হইলে আহ্লাদিত হইও না, আবার ফল মন্দ হইলেও দুঃখিত হইও না। কেবল করিতে হইবে বলিয়া করিয়া যাও, ভাল মন্দ যাহাই ফল হউক না কেন, সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিবে।"

আমরাও সব কাজ নিষ্কাম ভাবেই করিয়া থাকি, কিন্তু না বুঝিয়া করিয়া থাকি। যেমন নাকি এই ১২।১৪ বছর আগে আমার প্রিয়তম পুত্র, যাহাকে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসিতাম, যাকে একদণ্ড না দেখিতে পেলে কত কষ্টই বোধ করিতাম, যা কিছু ভাল খাবার জিনিস নিজে না খাইয়া, তার জন্য তুলিয়া রাখিতাম, আমার সেই প্রাণের পুত্তলি হঠাৎ আমাকে একদিন ফাঁকি দিয়া চিরবিদায় লইল। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, বুঝিবা তার সঙ্গে আমার প্রাণও বাহির হয়ে যায়। কিন্তু বস্তুতঃ সেরূপ কিছু হইল না। কিছুদিন কান্নাকাটি করিয়া আবার সেই আগেকার মত খাওয়া দাওয়া, কাজ কর্ম্ম সমস্তই করিতে থাকিলাম। তবে, সময় সময়, মধ্যে মধ্যে, তার ব্যবহৃত কিছু জিনিস চক্ষে পড়িলে, আমার প্রাণটা যেন "ছ্যাঁক্" ক'রে উঠিত, কিন্তু আজকাল ত তার কথা একটীবারও মনে পড়ে না। সে যে আমার কেউ ছিল এ কথা স্মরণ করে আনিতে হয়। এই ইহার নাম "নিষ্কাম ধর্ম্ম" যাহা

এখন আমার মনের বৃত্তি হয়ে দাঁড়াইয়াছে ঐ ছেলেটীর সম্বন্ধে। কিন্তু এইরূপ যদি প্রথম হইতেই বুঝে চলিতে পারিতাম, তবে আমি নিশ্চয় জ্ঞানীপদবাচ্য হইতে পারিতাম। কিন্তু আমি মোটেই জ্ঞানী নই, তাই এতদিন এত মনঃকষ্ট বৃথা ভোগ করিয়া শরীর ক্ষয় করেছি। আমি যদি তখন ভাবিতে পারিতাম, "ভগবান তুমি না চাহিতে একটী সুন্দর সন্তান আমাকে দিয়েছিলে, আচ্ছা বেশ করেছ, আমি তাহাকে এতদিন লালন পালন করে "মানুষ" করেছিলাম, এখন আবার তোমার জিনিস তুমি কাড়িয়া লইলে, তাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি, দুঃখ কষ্ট নাই।" যদি প্রথম হইতেই এই কথা ভাবিয়া প্রশান্ত চিত্তে থাকিতে পারিতাম, তবেই আমার নিষ্কাম ধর্ম্ম পালন করা হইত; কিন্তু হায়! আমি কতদূর অজ্ঞান তাই ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্যে দোষারোপ করিয়া নিজে কষ্ট ভোগ করিয়াছি।

এই সত্য ঘটনাটী এখানে উল্লেখ করার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা সকলে এখানে বাস করিতেছি,— এখানে দুঃখ কষ্ট, শোক তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা, অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য। ঐ সব আসিবেই আসিবে এবং এমন মানুষ কেহ নাই যিনি ঐ সমস্তকে না আসিতে দিয়া প্রতিরোধ করিতে পারেন। তবে তার জন্য দুঃখ করা কেন? আচ্ছা, দিনের পর রাত্রি আসিলে কি তুমি দুঃখ করিয়া থাকো?—না, গ্রীষ্মের পর বর্ষা কেন আসিল বলিয়া দুঃখ করিয়া থাকো? পূর্ণিমার পর অমাবস্যা আসিলে কিম্বা জোয়ারের পর ভাঁটা আসিলে যেমন তাহাতে দুঃখ করিয়া কোন ফল নাই বলিয়া তুমি দুঃখ করিতে বিরত থাক, সেইরূপ সুখের পর দুঃখ আসিলে কাঁদিবে কেন? পুত্র জন্মিলেও হাসিবে না, আবার

মরিলেও কাঁদিবে না, যেহেতু উহা দিনের পর রাত্রের মত, অথবা শীতের পর গ্রীষ্ম আসার মত জগতের অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য্য সনাতন নিয়মের অধীন। তবে তার জন্য হাসিবার বা কাঁদিবার হেতু কি আছে? এ রকম অহেতু কাঁদা তোমার ইচ্ছা হইলে, শত সহস্র বিষয়ে প্রতি নিয়ত, কান্না নিয়ে থাকিয়া তোমার দিন কাটাতে হয়। তবে বলি শুন:—আজ যে আমি তোমার জন্য এই উপদেশ লিখিতেছি,—যে আমি আজ গলিত-দন্ত, পলিত-কেশ, লোল-চর্ম্ম, কুব্জ-দেহ, যষ্টি-হস্ত, জীর্ণ শীর্ণ, হাড়গিলাটার মত চেহারাবিশিষ্ট হইয়াছি, সেই আমি একদিন আমার মাতার কোল জুড়ে, আলো করে, শুইয়া শুইয়া হাত পা নাড়িয়া কত খেলাই করিতাম, আর স্নেহময়ী জননী আমার, তাহা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিতেন। আমাকে একটীবার কোলে লইবার জন্য প্রতিবেশী স্ত্রী-পুরুষ কত চেষ্টা, কত আগ্রহ করিত। সেই আমি আবার ১০।১৫ বছর পরে এত পরিবর্ত্তিত হয়ে গেলাম যে, সেই সময় মধ্যে আমার গর্ভধারিণী মাতা আমাকে ঘটনাক্রমে না দেখিয়া থাকিলে, নিশ্চয় আমাকে তাঁহার ছেলে বলিয়া চিনিতেও পারিতেন না। এই সম্পূর্ণ আকার প্রকার সমস্তই পরিবর্ত্তন জন্য কেহত একটীবারও কাঁদিল না। আবার আর ১০।১৫ বছর পরে আর একটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন। এইরূপে পরিবর্ত্তন হইতে হইতে শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, কাটাইয়া এখন বার্দ্ধক্যে পৌছিয়াছি কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কাঁদে নাই; তবে কেন ইহার পরবর্ত্তী অবশ্যম্ভাবী অবস্থা যে পঞ্চত্ব, তাহা প্রাপ্ত হইলে তুমি কাঁদিবে কেন? তুমি কি জাননা, ইহা জগতের সেই সনাতন নিয়মের অধীন, যাহা গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য,

স্থাবর, জঙ্গম সকলেই নিজ নিজ নির্দ্দিষ্টকালে অবশ্যই ভোগ করিবে—তুমি আমি বাদ পড়িব কেন? তবে কিহেতু শোক দুঃখ? তাহলে, প্রতি মানবের প্রতি দিনের অদৃশ্য পরিবর্ত্তনের জন্য বিলাপ করা আবশ্যক হয়ে উঠে, কিন্তু ঐরূপ অবস্থা ঘটিবেই ঘটিবে ভাবিয়া তাই বুঝিয়া আমরা কেহ কাঁদি না। ইহাই "নিষ্কাম ধর্ম্ম।" ইহার নাম জ্ঞান। ইহা যে বোঝে, সে আনন্দে উৎফুল্ল হয় না; কিম্বা দুঃখেও ম্রিয়মান হয় না। তিনি হন জ্ঞানী। তাঁর মন কোন অবস্থাতেই বিচলিত, আন্দোলিত, আলোড়িত হইয়া মনের শান্তিভঙ্গ করে না।

তিনি হিমালয় পর্ব্বতের মত অচল, অটল। পার্থিব ঝঞ্ঝাবাত তাঁর কিছুই করিতে পারে না। সেই পর্ব্বতের চূড়া যেমন সর্ব্বদা উর্দ্ধমুখে রহিয়াছে, তেমনি সেই জ্ঞানীর দৃষ্টিও ভগবানে নিবদ্ধ রহিয়াছে। তিনি ভাবেন, ভগবান যা করান তাই করি, যা হওয়ান তাই হই, তার জন্য আমার বিচলিত হইবার দরকার কি? আমরা যেন তাঁর হাতের পুতুল। তিনি ইচ্ছামত বসাইতেছেন, উঠাইতেছেন, আবার শোয়াইতেছেন। ইহাতে আমাদের কর্ত্তৃত্ব কিছুমাত্র নাই। তবে কেন বৃথা "আমার আমার" ক'রে ভেবে মরি? আমি কত ক্ষুদ্র, আমি কত অক্ষম! একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পিপীলিকাও আমার আজ্ঞাধীন নহে। এই তুচ্ছ "আমির" হর্ষ, বিষাদ, রোষ, অভিলাষ, মান, অপমান, দম্ভ, অহঙ্কার! বড় লজ্জার কথা-বড় মূর্খের কথা। এই কথাটী যে বুঝেছে সেই পাগল হয়ে বনে চলে গেছে আর ফিরে নাই। ভগবান বুদ্ধদেব ইহা বুঝে-ছিলেন বলে, রাজসিংহাসন, স্ত্রী-পুত্র, সমস্তই ত্যাগ করে কৌপিন পরে বনে চলে গেলেন। এইরূপ, জ্ঞানী মাত্রেই সংসার-নির্লিপ্ত।

কিন্তু ভগবানের রাজ্যে সৌভাগ্যের কথা এই যে, এখানে সুখের দিন অপেক্ষা দুঃখের দিন অনেক কম। দুঃখ একগুণ ত সুখ চারিগুণ। তবে সুখের দিনগুলি শীঘ্র শীঘ্র গত হয়ে যায় এরূপ বোধ হয়, কারণ সেদিকে আমাদের মোটেই নজর থাকে না, তাই বোঝা যায় না। কিন্তু দুঃখের দিন,—যেন যাইতেই চায় না তাই লম্বা বোধ হয়। কারণ, সেদিকে আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। যেমন নাকি, সারা বছর রৌদ্র হইতেছে, সেদিকে মোটেই আমাদের নজর পড়ে না, অথচ বর্ষাকালে এক সঙ্গে ৩।৪ দিন সূর্য্য মেঘে ঢাকা থাকিলে, বড়ই বিরক্ত বোধ হয়, প্রাণ যেন আইটাই করে, মনে হয় যেন পূরো এক মাস সূর্য্যদেব্ উদয় হননি। যদি দুঃখের দিন, সুখের দিনের মত দীর্ঘস্থায়ী হইত, তবে মানুষগুলো নিশ্চয় পাগল হয়ে যেত।

দুঃখ যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন তুমি সর্ব্বদা দুঃখের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকিও, যেন হঠাৎ আক্রমণ ক'রে তোমাকে বিহ্বল করিতে না পারে। দুঃখ আসিলে তুমি ভাবিবে, এ-তো জানা কথা, তবে তার জন্য আবার চিন্তা কি? যে ব্যক্তি ঢাল তলোয়ার লইয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা ক'রে বসে থাকে, শত্রু তার কিছুই করিতে পারে না, কারণ সেত প্রস্তুত হয়ে বসে রয়েছে। সেই জন্য, দুঃখ নিশ্চয় আসিবে জানিয়া মন দৃঢ় ক'রে বসে থাকিবে, তার জন্য আবার ভয় কিসের? তবে উপস্থিত ক্ষেত্রে যথাসাধ্য দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিয়া, সুফলের আশা না করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে ভগবানে নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকো; ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সুপন্থা আর হইতেই পারে না। ইহাকেই "নিষ্কাম-ধর্ম্ম" পালন বলে।

দুঃখে যেমন ম্রিয়মান হইতে নাই আবার সুখেও তেমনি

উৎফুল্ল হইতে নাই, কারণ বর্ত্তমান সুখ কতক্ষণ?—না যতক্ষণ আবার পালাক্রমে, নিয়মমত, চন্দ্র সূর্য্যের গতির মত, আবার দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। তবে এ সংসাররূপ খেলাঘরের "রান্না, বান্না, পুতুলের বিয়ে" বিয়ে আহ্লাদে আত্মহারা হওয়া কেন? সবই মিথ্যা, সবই ক্ষণিক। কেবল একমাত্র সেই ভগবান সত্য ও চিরস্থায়ী। তাঁহাকে আপন বলিয়া ভাল বাসিলে আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুজনিত শোক ভোগ করিতে হইবে না; যেহেতু তিনি মৃত্যুঞ্জয় ও অবিনশ্বর। তাঁহাতেই নির্ভর কর চির সুখ পাবে। অতএব এই মহাজন-বাক্য স্মরণ কর,—

সুখস্যান্তরং দুঃখং, দুঃখস্যান্তরং সুখং।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানিচ দুঃখানিচ ॥

অর্থাৎ মনুষ্যের ভাগ্যে সুখদুঃখ পালাক্রমে আসে আর যায়; যেমন গাড়ীর চাকার কোন একটী অংশ একবার উপরে উঠিতেছে আবার পরক্ষণেই ভূমি স্পর্শ করিতেছে;—কখনই স্থির ভাবে একস্থানে থাকিতেছে না; সেইরূপ সুখদুঃখের আবির্ভাব ও তিরোভাব জানিবে।

সন্তোষ ও তৃপ্তি।

"ন যাতু কামঃ কামিনাং উপভোগেন সাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

অর্থাৎ যেমন আগুনে ঘৃতাহুতি দিতে থাকিলে, উহার তেজ, হ্রাস প্রাপ্ত না হইয়া, ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকে, তেমনি ভোগ বিলাসীদের ভোগ ইচ্ছা যতই চরিতার্থ করা যায়, ততই বাড়িয়া যায়। বস্তুতঃ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই; ভোগের দ্বারা উহার শান্তি হয় না। ভোগ দ্বারা উহা যতই পরিতৃপ্ত করিতে থাকিবে, ততই নিত্য নূতন আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হইয়া তোমাকে চির অসুখী করিবে।

কুরু পাণ্ডবগণের পূর্ব্ব-পুরুষ মহারাজা যযাতি, বহু বৎসর ধরিয়া রাজ-সুখ ও বিলাস-ভোগ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তৎপর, জরাগ্রস্ত হওয়াতে ইন্দ্রিয় ভোগ-সুখে একেবারেই অশক্ত বিধায়, নিজপূর্ব্বজাত যুবা পুত্র চারিজনকে বলিলেন, তাহারা যে কেহ তাঁহার জরা গ্রহণ করিয়া নিজের যৌবন তাঁহাকে প্রদান করুক। কিন্তু কেহই সম্মত না হওয়াতে, অবশেষে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু নিজ যৌবন, পিতাকে (হাজার বছর পরে ফিরাইয়া দিবার চুক্তিতে) প্রদান করিয়া পিতার জরা গ্রহণ করিল। রাজা যযাতি এইরূপে নব যৌবন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, আর এক হাজার বৎসর ধরিয়া মনের সাধে নানা প্রকার বিলাস ভোগ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না।

তৎপরে, প্রতিশ্রুত হাজার বছর গতে, পুত্রের যৌবন প্রত্যর্পণ কালে নিতান্ত ক্ষোভের সহিত উপরোক্ত শ্লোকটী প্রকাশ করতঃ নিজ জরা পুনঃ গ্রহণ করিলেন এবং পিতৃভক্ত পূরুকে নিজ উত্তরাধিকারী-স্বরূপ সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। এই উপাখ্যানটী মূলমহাভারতের আদিপর্ব্বে যযাতিবৃত্তান্তে পাওয়া যাইবে।

যেমন পর্ব্বতের গায়ে অতি ক্ষুদ্র একটী ঝরণা দিয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে থাকে। কিছুদিন পরে, ঐ জল জমিয়া অতি সূক্ষ্ম একটী স্রোতের আকারে নীচের দিকে বহিতে থাকে; ক্রমশঃ পথে সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরো পাঁচ সাতটা ছোট ছোট স্রোত তাহাতে মিলিত হইয়া, অপেক্ষাকৃত বড় আকার ধারণ করত, একটু বেশী জোরে নীচে নামিতে থাকে। তখন সেইরূপ আরো দশ পাঁচটা স্রোত তাহাতে মিলিত হইয়া, একটী নদীর আকার ধারণ করতঃ বেগে নীচে নামিতে নামিতে নূতন নূতন অনেকগুলি ছোট নদী তাহাতে আপতিত হইয়া, প্রবল বেগবতী নদীরূপ ধারণ করত, বাড়ী ঘর দুয়ার শস্যক্ষেত্র নষ্ট করিয়া, ক্রমে গ্রাম নগর উৎসন্ন করত, সমুদ্রে পড়িয়া নিজের অস্তিত্ব লোপ করিয়া, তবে এই ধ্বংস কার্য্যের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আমরা প্রতি বৎসর বর্দ্ধমান জেলায় দামোদর নদের দ্বারা এবং অন্যত্র নানা নদ নদীর দ্বারা এইরূপ ধ্বংস কার্য্য সাধিত হইতে শুনিয়া থাকি। সামান্য আরম্ভ হইতে ক্রমে কত বড় ক্ষতি-জনক কাজ হইতে পারে তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই নদীর কথা বলা হইল। পর্ব্বতের গায়ে ঐ সামান্য মূল আদি ঝরণাটির মুখ বন্ধ করা সহজসাধ্য ছিল; কিন্তু তাহা সময়মত না করাতে পরে কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটিল!

পূর্ব্বোক্ত নদীর উৎপত্তি রোধ করা মানুষের সাধ্যাতীত; কারণ উহার আদি ঝরণা শত সহস্র। কিন্তু ঐরূপ সহজসাধ্য অথচ পরিণামে ধ্বংসকারী জলপ্রবাহের দৃষ্টান্ত, হলাণ্ড দেশে কখনো কখনো ঘটিয়া থাকে। ইউরোপ মহাদেশ মধ্যে হলাণ্ড বলিয়া একটী দেশ আছে; যাহা নিম্নভূমি—বিধায় চতুঃ পার্শ্বের সমুদ্রজল দেশ মধ্যে প্রবেশ-রোধ জন্য উচ্চ বাঁধ দিয়া ঘেরা থাকে। এখন, সমুদ্রে জোয়ার আসিলে কখনো কখনো ঐ প্রকাণ্ড বাঁধের গায়ে ক্ষুদ্র একটী ছিদ্র হইয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে দেখিলে, লোকেরা নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া ঐ ছিদ্র বন্ধ ক'রে ফেলে; নতুবা অচিরে সমুদ্র-জল প্রবল আকারে দেশ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সারা দেশ জল মগ্ন ও ধ্বংস করে ফেলে।

এখন, মানুষের মনেব আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি ও বৃদ্ধি-প্রাপ্তি ও পরিণামে ধ্বংসলীলাও ঠিক ঐ প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথমে সামান্য একটী ইচ্ছা মনে উদয় হয়, সেইটী পূর্ণ হইলে, তখন আর তাহাতে সুখ হয় না। তখন আর একটী নূতন ইচ্ছার উদ্ভব হয়, তাহা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত মনে কষ্ট হইতে থাকে, কিন্তু যেই সেইটী পূর্ণ হইল, তখন আর তাহাতে সুখ বোধ হইবে না। তখন আবার নূতন চাই; এইরূপে শত ইচ্ছার ভোগ হইয়া নূতন শতটীর সৃষ্টি কিন্তু ভোগের পরে আবার সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা! তবে কিসে শান্তি? মনে দৃঢ় বল করিয়া নিবৃত্তি পথ ধরিতে পারিলে, তবেই দুরাকাঙ্ক্ষার শেষ। নতুবা কেবল জীবন শেষের সঙ্গে সঙ্গেই এই দুরাকাঙ্ক্ষাজনিত ব্যাকুলতার পরিসমাপ্তি;—যেমন পূর্ব্বোক্ত নদীর সমুদ্র মিলনে আত্মবিলয়।

বাসনার শেষ নাই,—কামনার অন্ত নাই,—পিপাসার শান্তি নাই।

এগুলি যতই প্রশ্রয় পাবে, ততই বাড়িতে থাকিবে সুতরাং অঙ্কুরেই ইহাদের বিনাশ সাধন করিতে হয়; নতুবা পরে আর কোন প্রকারেই ইহাদের, উচ্ছেদ সাধন করা যায় না। যেমন নাকি, তোমরা সকলেই দেখিয়াছ কোটা বাড়ীর ছাদের কোণে কার্ণিসের উপর একটী অশ্বত্থের অঙ্কুর এবং ছোট দুইটী লাল লাল পাতা, যাহা গৃহস্থ ইচ্ছা করিলে তখনি নখে কাটিয়া তুলিয়া ফেলিতে পারিত; কিন্তু অবহেলা করাতে ঐ অশ্বত্থের অঙ্কুর ক্রমে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া সমস্ত অট্টালিকা ধ্বংস করিয়া ভূমিসাৎ করিল। এক্ষণে এই পরাক্রমশালী, অট্টালিকা—ধ্বংসকারী শত্রু ওখানে কি প্রকারে আসিল? শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে, পাখীতে অন্যত্র হইতে পাকা ফল খাইয়া আসিয়া ঐ কার্ণিসের উপর বসিয়া বাহ্যে করিয়াছিল, যাহাতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (যাহা সরিষা অপেক্ষাও ছোট) এমন কতকগুলি বীজ ছিল। উহার একটী বীজ হইতে ঐ অঙ্কুরের উৎপত্তি,—অবশিষ্টগুলি নষ্ট হয়ে গিয়াছিল। ইহার দ্বারা তুমি বেশ বুঝিতে পারিতেছ সামান্য প্রারম্ভ হইতে কি ভয়ানক পরিণাম! এই কলিকাতা সহরে পিতৃহীন ধনী যুবক, কুসঙ্গে মিশিয়া কিরূপে নষ্ট হইতেছে তাহা অহরহঃ আমরা সকলেই দেখিতেছি। মহর্ষি মনু বলেছেন, "সন্তোষ ভিন্ন শান্তি নাই, পিপাসার অন্ত নাই"।

নেশাখোর যেমন একবার নেশায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিলে, পরে আর কিছুতেই সে নেশা পরিত্যাগ করিতে পারে না—পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক, ক্রমে ক্রমে, দিন দিন, ঐ নেশার মাত্রা বাড়িতেই থাকে; অবশেষে জীবন শেষ ভিন্ন ঐ নেশার শেষ হয় না। দুই একটী অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান নেশাখোর, নেশার অপকারিতা বুঝিতে পারিয়া, নেশাত্যাগ জন্য প্রতিদিন চেষ্টা করিয়া থাকে;—

প্রতিদিন ভাবে, কাল্ হইতে আর নেশা করিব না—আজ একটু বেশী করিয়া খাইয়া পরিতৃপ্ত হই; কিন্তু দিন গতে আবার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, এবং আগামী কল্যকার জন্য নূতন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ! এইরূপ করিতে করিতে জীবন শেষ; কিন্তু নেশা ত্যাগ আর হইয়া উঠে না। ভাগ্যক্রমে কদাচিৎ দুই এক জন নেশাখোর প্রবল মনের বলের দ্বারা নেশা পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়। এখন, ভোগ বিলাসও এক প্রকার নেশা। উহা ত্যাগ করিতে প্রবল মনের বলের দরকার, নতুবা কিছুতেই নিবৃত্তি পথ ধরিয়া থাকা যায় না—সুতরাং ভোগ বিলাসের কুহকে পড়িয়া চিরকাল আত্মগ্লানি ভোগ করিতে করিতে অশান্তিময় হৃদয়ে মৃত্যুর দ্বার দিয়া আসিয়া অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

জীবনের কর্ত্তব্য।

সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, এই তিনটী ভগবানের চিরস্থায়ী নিয়ম। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়েছে, এখন আছে, আবার যুগযুগান্তর পরে নিশ্চয় ইহার বিনাশ হইবে। আজ যাহা আছে, কাল তাহা আর থাকে না। কেবল মৃত্যুই মহাসত্য। ইহা খণ্ডন করে কার সাধ্য? ধনৈশ্বর্য্য, আত্মীয়-স্বজন, কেহই সেই অলঙ্ঘনীয় মহাসত্য যে মৃত্যু, তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না। সুখ দুঃখ যাইতেছে, আবার আসিতেছে, আবার যাইতেছে, কিন্তু মৃত্যু সর্ব্বদা সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রহিয়াছে। এই মূল্যবান কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া আলস্য ও ব্যগ্রতা পরিহার পূর্ব্বক নিজের চিত্ত, ধীর ও প্রশান্ত রাখাই জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

কামনাশূন্য হইয়া প্রশান্ত মনে সংসারের কাজ করিতে থাকিয়া ভাবিবে, আমি এখানে ভগবানের কাজ করিতেছি, এখানে আমার নিজের কিছুই নাই। সুখ দুঃখে বিচলিত না হইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকাই শান্তি লাভের একমাত্র উপায়। কিন্তু উহা আমরা ভুলিয়া গিয়া, যেমন ভাবিতে আরম্ভ করি,—"এই সংসার আমার, এই সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য আমার, এই পুত্র কন্যা আমার, এই সব লইয়া আমি চিরকাল ভোগ করিব, আমি অজর অমর"—তখনই আমাদের মনে মোহ আসিয়া প্রকৃত সত্যজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে; সুতরাং ভাবী কষ্টের বীজ মনোমধ্যে অঙ্কুরিত হইতে থাকে।

মনে কর তোমার চাকর যেমন তোমার সংসারের সমস্ত কাজই নিজের বাড়ীর মত মনে ক'রে, করে থাকে। তোমার সন্তানদের

লালন পালন করে এবং কাহাকেও "দাদাবাবু" কাহাকেও "দিদি-মণি" বলে ডাকে; কিন্তু এই আদর যত্ন, ডাকাডাকি কতক্ষণ?—না, যতক্ষণ সে তোমার বাড়ীতে আছে। তাহাকে বিদায় করে দাও, সে আবার অন্য বাড়ীতে গিয়া ঐরূপ সম্বন্ধ পাতাইবে; তখন সে তোমার ছেলে মেয়ের দিকে ফিরেও তাকাবে না। তুমিও সেইরূপ ভাবে তোমার সংসারকে দেখিবে। তুমি ভাবিবে এই সংসার ভগবানের এবং তুমি তাঁর চাকর। এই সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য পুত্রকন্যা প্রভৃতি ভগবান্ কিছু কালের জন্য তোমার জিম্বায় রাখিয়াছেন আবার এই মুহূর্ত্তেই তোমার হাত হইতে লইয়া অন্য চাকরের জিম্বায় দিবেন; তাতে তোমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? তোমার সংসারের লাভ লোকসান হইলে, যেমন তোমার চাকরের উহাতে কিছুমাত্র আসে যায় না, সেইরূপ তোমার প্রভুর এই সংসারের ধনৈশ্বর্য্য নষ্ট হউক, কি শ্রীবৃদ্ধি হউক, তোমার পুত্রকন্যা সমস্তই লয় পাউক কি জন্ম লউক তাতে তোমার ভাবিবার চিন্তিবার কি কাঁদিবার হেতু নাই। প্রভুর জিনিষ প্রভু তা বুঝিবেন। তুমি কেবল নিজ কর্ত্তব্য করে যাবে, যাতে প্রভু অসন্তুষ্ট না হন। বাস্ তোমার সঙ্গে প্রভুর এই চুক্তি। ইহাকেই বলে "নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধন"।

কর্ত্তব্য-পরায়ণ চাকর, প্রভুর কাজ করিতে করিতে অনেক বিপদে পড়ে ও কত কষ্ট পায়, কিন্তু তজ্জন্য সে প্রভুকে একবারও মন্দ বলেন না; তবে তুমি দুঃখ কষ্টে পড়িলে কাঁদিবে কেন? তুমি ভাবিবে, ইহা তোমার প্রভুর আদেশ সুতরাং মানিতেই হইবে। আর তোমার কত সহিবার শক্তি আছে, তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া সেই মত পুরস্কার কি তিরস্কার তোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট

ক'রে রেখেছেন। দুঃখ যতই অসহনীয় হউক না কেন, শোক তাপ যতই প্রবল হউক না কেন, ধীর ভাবে কিছু কাল সহ্য করিলে আবার সুদিন আসিবে। যেমন শীতের পর গ্রীষ্ম, অমাবস্যার পর পূর্ণিমা, ও রাত্রের পর দিন আসে সেইরূপ দুঃখের পর সুখ আসিবেই। তবে প্রথম বেগটা সহ্য করা প্রচুর মনের বলের দরকার—সে যেমন গঙ্গায় বান্ ডাকে। কিন্তু তার জন্য আগে থেকে প্রস্তুত থাকিতে পারিলে আর ভয় কিসের? কিন্তু যে তাহা বুঝিয়াও পূর্ব্ব হইতে সতর্ক না থাকে, তাকেই বিপদে বিহ্বল করে, এবং তার বুদ্ধি লোপ পাইয়া প্রকৃত বিপদকে বরং বৃদ্ধি করে দেয়। আপদ বিপদ আসিলে যথাসাধ্য প্রতিকার চেষ্টা করিবে। পারিলে ভালই—না পারিলেও কথা নাই। ভাবিবে,—ভগবান ভালর জন্যই এই বিপদ আপদ তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন।

কামনা বর্জ্জন ও আশা-ত্যাগকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, জগতের নশ্বরত্ব ও ভগবানের চিরস্থায়িত্ব ধ্যান করিতে করিতে সংসারের কর্ত্তব্য সম্পাদন করতঃ অন্তিমে মৃত্যুর দ্বার দিয়া সেই শুভ-ধামের দিকে অগ্রসর হওয়াই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। শয়নে ভোজনে, সকল অবস্থাতেই আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন ও ভগবানের উপর নির্ভরতা অবলম্বন পূর্ব্বক নির্লিপ্ত ভাবে সংসারের কার্য্য সম্পাদন ও ভগবানের শান্তিরূপে তন্ময় থাকাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। সেই মহিমময় ধ্রুবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া, আশা ও কামনা-শূন্য হৃদয়ে আপন কর্ত্তব্য করিতে থাকাই ভগবানের যথার্থ পূজা। এইভাবে জীবন কার্য্য শেষ করিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলেই ভগবানের সন্তোষ। সমগ্র

বিশ্বে তাঁর প্রেম-মূর্ত্তি দেখিয়া, মৈত্রী ভাবে প্রেম-পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হইবে;—কারণ এই বিশ্বই তাঁহার পরিদৃশ্যমান জ্বলন্ত প্রতিমা। সর্ব্বভূতে, তোমার নিজ আত্মার ন্যায় দয়ামায়া-মমতা বিস্তার করিতে হইবে। কারণ কেহই তোমার পর নহে; যেহেতু আমরা সকলেই যখন সেই এক ভগবানের সন্তান তখন সকলেই আমার আপন ভিন্ন পর নহে।

মহাত্মা বিবেকানন্দ স্বামী বলেছেন,—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন; সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" তবেই তুমি সারা বিশ্বময়, সর্ব্বব্যাপী মহা প্রেমে আপনাকে ডুবাইয়া চিরশান্তিতে জীবন কাটাইতে পারিবে। দুঃখ কষ্ট, আপদ, বিপদ, রোগ, শোক, কিছুতেই তোমার মনের প্রসন্নতা নষ্ট করিতে পারিবে না।—যেহেতু তোমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তুমি প্রভুর কাজে ঔদাস্য কি অবহেলা কর নাই। সুতরাং মৃত্যুর পরেই তিনি তোমাকে পায়ে স্থান দিবেন। ইহাই জীবনের কর্ত্তব্য। এইরূপ কত জন্ম করিয়াছি এবং আরো কত জন্ম করিতে হইবে তা তিনিই জানেন; আমাদের সে চিন্তা করার কিছুই আবশ্যকতা নাই। শাস্ত্রে আছে;—

চলৎ চিত্তং চলদ্ বিত্তং চলৎ জীবন-যৌবনং।
চলাচলং ইদং সর্ব্বং কীর্ত্তিঃ যস্য স জীবতি।

অর্থাৎ ধনৈশ্বর্য্য জীবন যৌবন সমস্তই ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যে ব্যক্তি সৎ কাজ করিয়া কীর্ত্তি স্থাপন করে তাহারই নাম চিরস্থায়ী হয়—ও চিরস্মরণীয় থাকিয়া যায়।

* * * *

১নং গীত।

তুমি কার, কে তোমার, কারে বলরে আপন।
মহামায়া-নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন॥
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে তারা দশ দিকে ধায়।
তেমতি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব,
সময় হইলে সবে করে পলায়ন॥
দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমার?
—ক্ষণেকের তরে মাত্র তোমার মিলন।
অতএব মূঢ় মন, চেনোরে আপন জন,
মিছা মায়া ত্যাগ কর, স্মর ভগবান॥

—রাজা রামমোহন রায়।

* * * *

২নং গীত।

তুমি দিয়েছিলে নাথ তুমিই নিয়েছ ফিরে।
কেন হাহাকার তাহে, কেন ভাসি আঁখি নীরে?
যে কদিন কাছে ছিল, তারি আশা তারি প্রীতি,
তারি নিরমল শান্তি, তাহারি মধুর স্মৃতি।
আজি যে জাগিছে হৃদে এও কি সামান্য দান?
এইটুকু পেয়ে যেন পরিতৃপ্ত রহে প্রাণ।
সূক্ষ্ম দৃষ্টি দাও প্রভু! হৃদয়েতে দাও বল,
অশুভ না হেরি যেন তব কার্য্যে হে মঙ্গল॥

রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

* * * *

৩নং গীত।

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।
তোমারি করুণা স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখ, দাও তাপ, সকলি সহিব আমি॥
তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে, জেনেও জানি না,
ঐ মঙ্গল রূপ, তাই শোক সাগরে নামি॥
আনন্দ তোমার বিশ্ব, শোভা সুখ পূর্ণ;
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই বাসনা-অনুগামী॥
মোহ-বন্ধ ছিন্ন কর কঠিন আঘাতে,
অশ্রু-সলিল-ধৌত-হৃদয়ে থাকো দিবসযামী॥

রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বিধাতা—
বিলীন শাভের মধ্যে অশান্তি ও দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধি
ভগবানের,
সব পাইলেও
দুই নম্বর ক জের কথা হচ্ছে :—আমরা সকলেই যখন
বিমর্ষ হই
রে কয়েক নের জন্য আছি, তখন যে কয়দিন বাঁচিব
আমার
চ্ছন্দে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। সুখ, কেহ কাহাকে দিতে
আমা
না। নিজের মনে সুখের সৃষ্টি করিয়া ভোগ করিতে হয়। ধনী লোকের মত কাল্পনিক দুঃখের সৃষ্টি করে, মনে কষ্ট পাইলে তুমি নিজেই তার জন্য দায়ী। আর যদি যথার্থ ই দুঃখ আসে (যাহার হাত হইতে এড়াইবাব জো নাই) তখন এই ভাবিবে, ভগবান্ আমার সঙ্গে এই চুক্তি করিয়া সংসাবে অবশ্যই পাঠান নাই, যে আমার ভাগ্যে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ ঘটিবে। আবার সুখ আসিলে তারপরে দুঃখও আসিবে। "সুখস্যান্তরং দুঃখং দুঃখস্যান্তবং সুখং। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানিচ দুঃখানিচ॥" আবো ভাবিবে, সীতা রাজকন্যা, রাজপুত্রবধূ, রাজরাণী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর অংশভূতা হইয়াও চিরবনবাসিনী ও চির-দুঃখিনী! আবার দ্রৌপদী, দময়ন্তী, চিন্তা, শৈব্যা, সাবিত্রী সকলেই বনবাসে কত কষ্ট ভোগ করেছেন। অতএব কোন প্রকার দুঃখ উপস্থিত হইলে মন দৃঢ় ও সবল রাখিয়া ইঁহাদের কথা ভাবিবে ও শান্তি পাবে।

(৩) তিন নম্বর কাজের কথা হচ্ছে—"চিরদিন কভু সমান না যায়" এই প্রবাদ বাক্যটী অতি সত্য। ধনৈশ্বর্য্য, সুখসম্পদ, উন্নতি অভ্যুত্থান কিছুই চিরস্থায়ীত নহেই, পরন্তু দীর্ঘস্থায়ীও নহে—সবই ক্ষণস্থায়ী মাত্র। অসীম পরাক্রমশালী ভারতব্যাপী মোগল সাম্রাজ্য,—সেই ময়ুর সিংহাসন, যাহার অধীশ্বরকে লোকে "দ্বিতীয় জগদীশ্বর" বলিয়া জয়গান করিত, সেই অতুল বৈভব, আজ অনন্ত

কাল-সাগরের জলে, বুদ্বুদের ন্যায় উঠিয়া, আবার তখনি
হইয়াছে! বস্তুতঃ উত্থান হইলেই পতন নিশ্চিত [illegible]
পরম জ্ঞানী বৈষ্ণব চূড়ামণি সনাতন গোস্বামী, [illegible]
পরায়ণ মদগর্ব্বিত সহোদরকে জ্ঞান-উপদেশছলে, যাহা
লিখিয়াছিলেন তাহা সকলেরই প্রণিধান যোগ্য :—

যদুপতেঃ কগতা মথুরাপুরী,, রঘুপতেঃ কগতোত্তর কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্বমনোস্থিরং, নসদিদং জগতি ইত্যবধারয়॥

অর্থাৎ “যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের সেই সমৃদ্ধিশালিনী মথুরা নগরী আজ কোথায়? আবার রঘুপতি রামচন্দ্রের সেই উত্তর কোশল রাজ্যই বা আজ কোথায় রহিল? ইহা চিন্তা করিয়া মনস্থির করিবে এবং এই জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। উন্নতির সময়ে ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া বিনয় নম্রতা ভুলিয়া অত্যাচারপরায়ণ না হই; তাহলে ভগবান আবার শীঘ্র শীঘ্র অবনতি পাঠাবেন। অহঙ্কার জিনিসটা ভগবানের বড়ই অপ্রিয়। অহঙ্কার হইলেই পতন নিশ্চয়। স্মরণ রাখিবে—“পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।”

(৪) চারি নম্বর কাজের কথা হচ্ছে—আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ মায়ামোহে আবদ্ধ হইয়া এই সংসার, ধনৈশ্বর্য, পুত্রকন্যা সব “আমার আমার” ভাবিয়া কষ্ট পাইয়া থাকি। ভাবিয়া দেখিলে, ইহার কিছুই আমার নহে; যেহেতু ইহাদের উপর আমার কিছু মাত্র অধিকার বা কর্ত্তৃত্ব নাই। কারণ এর একটাও নষ্ট থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নাই, অথবা নষ্ট হইলে পুনরায় বজায় করার সাধ্যও আমার নাই; অতএব এসব কিছুই আমার নহে। তবে এরা কার? এরা সব ভগবানের, যিনি এদের সৃষ্টি বিনাশের

বিধাতা—দেওয়া নেওয়ার কর্ত্তা। "সংসার এবং পুত্রকন্যা সমস্তই ভগবানের" এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যদি আমার থাকে, তবে এই সব পাইলেও আমি উৎফুল্ল হই না, আবার বিয়োগ হইলেও বিমর্ষ হই না। কেবল ভগবানের জিনিস কয়েক দিনের জন্য আমার কাছে গচ্ছিত আছে ইহাই ভাবিব। বস্তুতঃ ঐ সমস্তে আমার কিছু মাত্র স্বত্ব-স্বামিত্ব নাই। সুতরাং গচ্ছিত ধন ফিরাইয়া লইলে যদি মনে কষ্ট বোধ করি ত আমি বড় মূর্খ—বড় নির্ব্বোধ। আসক্তি হইতেছে কষ্টের কারণ। আসক্তিত্যাগেই শান্তি।

মাতাল যেমন ধুলা কাদা মাখিয়া, রাস্তার ধারে পগারের মধ্যে পড়িয়া থাকিয়া, কখনো হাসে, কখনো কাঁদে, কখনো বা রাস্তার লোকদিগকে গালি দেয়। তাহাকে মাতাল বলিয়া যে না জানে, সে হয়ত ঐ ভাবে কাঁদিতে দেখিলে মনে করে, না জানি লোকটা কি গভীর শোকগ্রস্ত অথবা গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে তাই এরূপ কাঁদিতেছে। কিন্তু সহানুভূতি বশতঃ কারণ জিজ্ঞাসা অথবা যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য কেহ নিকটে গেলেই গালি খাইয়া ফিরিয়া আসে ও তখন প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে। ঐ মাতাল ভাবিতেছে তাহার হাসা, কাঁদা, বকা, সমস্তই ঠিক ঠিক করা হইতেছে; কিন্তু অপরে বুঝিতেছে সে প্রকৃতিস্থ নহে, তাই নেশার প্রভাবে সমস্তই ভুল করিতেছে। এখন, আমরা এই সংসারে থাকিয়া সমস্তই ঐ মাতালের মত করিতেছি আর ভাবিতেছি, কিছুই আমরা ভুল করিতেছি না; সমস্তই যথা উপযুক্ত ভাবে করা হইতেছে। কিন্তু একটীবারও ভাবিয়া দেখি না যে, আমাদের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে এবং আমাদের

যথার্থ জ্ঞান মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন রহিয়াছে। ঐ মাতালের ভুল যেমন সে নিজে বুঝে না, অথচ আমরা বেশ বুঝিতে পারি সেইরূপ আমাদের সংসারে থাকিয়া এই ভুল হাসা, কাঁদা, গাল দেওয়া, দর্প, অহঙ্কার করা, আমরা নিজেরা যথা উপযুক্ত মনে করিলেও যিনি জ্ঞানী তিনি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়া মনে মনে হাসিতেছেন।

আবার, ছোট ছোট মেয়েরা ইটের ঘর করিয়া নারিকেল-মালা, খোলা, খাপরা ইত্যাদি লইয়া সংসার পাতানর অভিনয় করিবার সময় অপর একটী মেয়ে আসিয়া উহা হইতে একটা ঠোলা, কি মালা, কি ভাঙা খোলা, খাপরা এইরূপ কিছু অকিঞ্চিৎকর একটা জিনিষ লইয়া থাকিলে ঐ পূর্ব্বকার কল্পিত গৃহস্বামিনীর সঙ্গে এমন মারামারি, চুলছেঁড়াছিঁড়ি, কামড়াকামড়ি, এমন কি রক্তারক্তি পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে যে, কেহ আসিয়া ঐ বিবাদকারিণীদ্বয়কে পৃথক করিয়া না দিলে ঘটনা আরো গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। তখন হয়ত কোন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি আসিয়া বিবাদভঞ্জনকালে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হাসিতে থাকেন কিন্তু তিনি একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, উহারা অতি ক্ষুদ্র সামান্য জিনিস লইয়া যাহা করিতেছে, তিনিও নিজে উহা অপেক্ষা সামান্য একটু বড় একটা জিনিস লইয়া সংসারে কত জনের সঙ্গে কত প্রকারে বিবাদ করিয়া থাকেন। বিরোধীয় জিনিসের মূল্যের তারতম্য হিসাবে ঐ বালিকাদের ও তাঁহার মধ্যে প্রভেদ এত কম যে তাহা হয়ত ভগবানের চক্ষে গুণ্‌তিতেই আসে না। ঐ বালিকাদ্বয় ও এই বুদ্ধিমান ব্যক্তি তুল্যরূপ মোহাচ্ছন্ন।

এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত উপন্যাস-লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

লিখিত "অরক্ষণীয়া" নামক পুস্তকের কথা মনে পড়িল। গল্পের প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন যে, প্রিয়নাথ ও অনাথ নাগ দুই সহো[illegible]পরস্পর ঝগড়া করিয়া নিজেদের পৈত্রিক ভদ্রাসন বাটী দড়ি মাপিয়া এমন ভাবে সূক্ষ্ম বিভাগ করিয়া লইল যে, কেহ যেন এক চুলও না ঠকে; অধিকন্তু প্রিয়নাথ উঠানের মাঝখানে পাঁচিল উঠাইয়া, ও পরে উভয় পরিবার মধ্যে মুখ দেখা-[illegible] ও কথাবার্ত্তা না হইতে পারে, এই সাবধানতা রক্ষাকল্পে নূতন পাঁচিলের গায়ে একটা দরজা রাখাও আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। কিন্তু তাহার ঐ সতর্কতা দেখিয়া ভগবান্ হয়ত হাসিয়াছিলেন; যেহেতু ঐ ঘটনার এক মাস মধ্যেই প্রিয়নাথের মৃত্যু হইল এবং তাহার বিধবা স্ত্রী ও কন্যার পক্ষে অনাথের কাছে অনেক প্রকারে সাহায্য চাহিতে হইয়াছিল। এখন, আমাদের প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিত যে, তাহার বর্ত্তমান কার্য্য প্রিয়নাথের কাজের ন্যায় ভগবানের চক্ষে হাস্যজনক হইতেছে কি না। আমাদের চক্ষের মোহের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেলে ভগবান আমাদের কাজ দেখিয়া আর হাসিবেন না।

(৫) পাঁচ নম্বর কাজের কথা,—চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন,—

ন কশ্চিৎ কস্যচিৎ মিত্রম্ ন কশ্চিৎ কস্যচিৎ রিপুঃ।
ব্যবহারেণ জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥ অর্থাৎ

কেহ কারু মিত্র নহে, কিম্বা কেহ কারু শত্রুও নহে। আমরা ব্যবহার দ্বারা শত্রু মিত্র সৃষ্টি ক'রে লই। ইহা অতি সত্য কথা। শত্রু মিত্র সৃষ্টির প্রধান উপাদান হচ্ছে—ক্ষমাগুণ ও মিষ্ট কথা। মিষ্ট কথায় শত্রুও বশ হয় এবং ইহাতে কিছু মাত্র ব্যয় নাই। পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিকে এক ঘটী শীতল জল দিলে যেমন বিনা

ব্যয়ে তাহার তৃপ্তি সম্পাদন করা যায়; যেমন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড গরমে একখানা সামান্য তালপাতার পাখা পাইলে বিনা ব্যয়ে শরীর শীতল হয়, সেই রূপ প্রচণ্ড উগ্র প্রকৃতির [illegible] মিষ্ট বাক্য প্রয়োগে ঠাণ্ডা করা যায়। "পরমুখে কটুকথা সহিতে না পার। তবে আগে আপনার মুখমিষ্ট কর॥"

এ স্থলে লেখকের এই বৃদ্ধ বয়সের বহুদর্শনের অভিজ্ঞতার ফলে যাহা শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহাই লিখিয়া দিয়া আমার আত্মীয়া-দিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি। স্ত্রীলোকের অধরে মধুর হাসি, নয়নে মনোহারিণী দৃষ্টি, মুখে মিষ্ট কথা, উপযুক্ত কালে, উপযুক্ত পাত্রে, সুপ্রয়োগ, করিতে পারিলে, অসাধ্য সাধন করা যায়, যাহা কোন পুরুষে বিস্তর চেষ্টায়, বিস্তর অর্থ ব্যয়েও করিতে পারে না। একারণ এই ভগবৎ-প্রদত্ত মহাশক্তি, কোন স্ত্রীলোক নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ অপপ্রয়োগ করিয়া নিজের ইহকাল পরকাল নষ্ট করত, পিতৃকুল-শ্বশুরকুলের মুখে চিরকালের কলঙ্ক-কালিমা লেপন না করে ইহাই আমার সাবধানতা। সংসারানভিজ্ঞা, অপরিণত-বয়স্কা, পরিণাম-চিন্তাশূন্যা, বুদ্ধিহীনা, তরুণীরা কখন কখন কৌতূহল-চরিতার্থ জন্য, নিজ বিষময় অমোঘ ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া, পরিশেষে সেই বিষে নিজে ও আত্মীয়-স্বজন চিরকাল জ্বলিয়া মরিয়া থাকে, ইহা আমি অনেক স্থানে দেখিয়াছি; কিন্তু উহারা তাহার কিছুই পূর্ব্বে বুঝিতে পারে না বলিয়া আমার এই সতর্কতা ও আশঙ্কা। পাপ-প্রলোভনের আকর্ষণ অতি শক্তিশালী, যাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করার মনের বল আরো বেশী শক্তিশালী হওয়া একান্ত দরকার। জীবনে পাপের সুযোগ শতদিন আসিবে কিন্তু "মানুষের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিলেও আমরা কখনই সেই

অন্তর্যামী ভগবানের দৃষ্টির আড়ালে যাইতে পারিব না” ইহা মনে করিয়া সমস্ত পাপ-সুযোগ-সুবিধা, ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিতে হইবে।

এক্ষণে যাহা বলিতেছিলাম,—পরের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে মহাত্মা যিশু বলিয়াছেন,—“তুমি নিজে অপরের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, ঠিক সেইরূপ ব্যবহার তুমি অপরের সহিত করিবে।” আমি অনেক স্থানে দেখিয়াছি, পিতাপুত্রে ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঝগড়া, এমন কি মুখ দেখাদেখি, বাক্যালাপ বন্ধ আবার অন্যত্র বহু স্থানে দেখিয়াছি, নিতান্ত দূর-সম্পর্কীয় অথবা নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ এক বাড়ীতে এক সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। ইহার হেতু হচ্ছে, পরস্পর মিষ্ট কথা, মিষ্ট ব্যবহার এবং ক্ষমা ও সহ্যগুণ। যুক্ত পরিবার মধ্যে প্রথমে অতি সামান্য কারণেই মনোমালিন্য আরম্ভ হয়,—যেমন নাকি ছেলের জন্য একটু দুধ, কি একটা ফল, কি একটা খেলানা, কি সামান্য দুই একটা পয়সা। কিন্তু ইহা তখনি থামাইতে না পারিলে ক্রমে প্রকাশ্য ঝগড়া, তার পর মুখ দেখাদেখি বন্ধ। ক্রমে হয়ত নির্ব্বোধ অপরিণামদর্শী স্ত্রীলোকের দ্বারা নিজ নিজ স্বামীকে উত্তেজিত করিয়া, মারামারি, খুনোখুনি পর্য্যন্ত হইয়া উভয় পক্ষ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এই শোচনীয় পরিণাম ঘটিতে না দিতে হইলে প্রথম হইতেই সাবধান হইতে হয় এবং সকলেই যেন পরস্পরের প্রতি মিষ্ট কথা, মিষ্ট ব্যবহার ও ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে থাকে। যেমন সামান্য একটু আগুন প্রথমেই না নিবাইলে উহা ক্রমে এত বাড়িয়া উঠে যে, তখন তাহা আর কিছুতেই নিবানো যায় না। তখন ক্রমে বাড়ী ঘর সমস্ত পোড়াইয়া ছারখার করে—এমন কি

নিরীহ নির্দ্দোষ লোকের ও সর্ব্বস্বান্ত এবং দেবালয় পর্য্যন্ত ভস্মীভূত করিয়া শেষ করে !

৬) ছয়ের নম্বর কাজের কথা হচ্ছে :—সর্ব্ব প্রযত্নে নিয়ত ষড় রিপুকে দমনে রাখা। রিপু মানে শত্রু; ষড় রিপু হচ্ছে ছয়টী বলবান শত্রু যাহারা মানুষের মনের মধ্যে বাস করিয়া সেই মানুষেরই সর্ব্বনাশ করে থাকে। এই ছয়টী মনের শত্রু, সকল মানুষেরই মনে জন্মিয়া থাকে কিন্তু জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্ লোক তাহাদিগকে দমনে রাখিয়া কোনো কুকার্য্য করিতে দেন না, পরন্তু তাহাদের দ্বারা ভাল কাজই করাইয়া লয়েন। যেখন নাকি আগুন, যাহাকে বুদ্ধি পূর্ব্বক সাবধানে ব্যবহার করিয়া, তাহা দ্বারা আমরা ভাত রাঁধিয়া খাই, রেলগাড়ী ও কত কল-কারখানা চালাই, কিন্তু ঐ আগুন একটু অসাবধানে বাড়িতে পারিলে, বাড়ী ঘর এমন কি গ্রাম নগর পর্য্যন্ত পোড়াইয়া ছারখার করে। যেমন বিদ্যুৎ, যাহা বজ্ররূপে মেঘের মধ্যে থাকিয়া সময় সময় মানুষ মারে, গাছ, বাড়ী ঘর, পোড়ায়, মন্দির গুঁড়া করে, এমন কি পাহাড় পর্য্যন্ত চূর্ণ করে দেয়। আবার ঐ বিদ্যুৎ, বুদ্ধি-পূর্ব্বক সাবধানে ব্যবহারের দ্বারা আমরা ট্রাম চালাই, পাখা ঘোরাই, রাস্তা ও ঘরে আলো জ্বালাই, আবার দেশ দেশান্তরের সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে আনাইতেছি। আবার দেখ, কেউটে সাপের বিষ, যাহার অতি সামান্য দ্বারাও মানুষ ম'রে যায়, কিন্তু সেই সাংঘাতিক বিষ কবিরাজেরা শোধন করিয়া লইয়া এমন অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন, যাহার কণিকামাত্র সেবনে মুমূর্ষু রোগী বাঁচিয়া উঠে। এখন, এই তিনটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে পারিতেছ যে, অতি ভয়ানক যে জিনিস তাহাকেও সুব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত ক'রে অতি ভাল কাজ করিয়া লওয়া যায়। এই জন্য

এই অতি ভয়ানক প্রবল শত্রু-রূপে প্রবল মিত্র-গুলিকে ভগবান্ আমাদের হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন॥ সাধারণতঃ ইহাদিগকে "ষড় রিপু অর্থাৎ ছয়টী শত্রু" বলা হয় এই জন্য যে, যে জ্ঞান, যে বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা ইহাদের দিয়া মহাশুভ কাজ করানো যায়, সে জ্ঞান, সে বুদ্ধি প্রায় সমস্ত লোকেরই নাই। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই ইহাদের সাহায্যে মন্দ কাজ ক'রে থাকে, যেহেতু মন্দ কাজ করার প্রলোভন ইহাদের এত বেশী যে তাহা এড়ানো বড়ই কঠিন। তাই এদের নাম হয়েছে "ষড় রিপু।"

আমি এখানে তোমাকে তাদের মন্দ কাজের বিষয় কিছু কিছু বলিয়া, সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাল কাজেরও ইঙ্গিত করিতেছি। ইহাদের ভাল কাজের বিষয় বলিয়া শেষ করা যায় না, আর সে সব না বলিলেও তত ক্ষতি নাই। ঐ ছয়টী মনের শত্রু, এই যথা :—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। ক্রমে ইহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে পৃথক ভাবে নীচে কিছু কিছু বলা যাইতেছে।

প্রথম কাম। কাম অর্থে কামনা, ইচ্ছা। ইহার আর একটী অর্থ হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষের মিলন ইচ্ছা। এই কাম হচ্ছে অতি প্রবল ভয়ানক রিপু, তাই ইহার নাম সকলের প্রথমে। ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে প্রবল মনের বল, ধর্ম্মজ্ঞান ও ভগবানের কৃপা চাই। অনেক জ্ঞানী, অনেক মুনিঋষিও কামের কাছে পরাভূত হইয়া চিরসঞ্চিত তপঃ-প্রভাব অথবা জীবন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন সুতরাং সাধারণ লোকে যে কাম দমন করিতে পারে না তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে একান্ত মনে চেষ্টা করিলে অবশ্যই পারা যায়, যাহা আমরা চোকের উপর সর্ব্বদাই দেখিয়া থাকি।

কামরিপু প্রশ্রয় পাইলে অবিলম্বে এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, ধর্ম্ম, অর্থ, বিত্ত, জ্ঞান, তপঃ, জপ, মান, সম্ভ্রম এমন কি জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করে ফেলে। একারণ অতি যত্নের সহিত কামের দমন সাধন করিতে হইবে। কাম দমন জন্য নিম্নে কয়েকটী উপায় লিখিত হইল। সৎসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ, ভগবানে ভক্তি, ব্রহ্মচর্য্য, বৈরাগ্য, উপবাস, নিরামিষ ভোজন, "মানুষের পরিণাম যে মৃত্যু তৎবিষয়ক স্মরণ," ইত্যাদিতে কাম দমন থাকে। আর কুসংসর্গ, অশ্লীল আলোচনা ও চিন্তন, নাটক নভেল প্রভৃতি প্রণয়-ঘটিত-ব্যাপার পাঠ, কি অভিনয় দর্শন, বয়স্যাদের সহিত কুৎসিত বিষয়ক আলোচনা, কৌতুক, তামাসা, অশ্লীল ছবি দেখা, ডিম্ মাংস আহার ইত্যাদিতে কামবৃত্তির উদ্রেক ও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। একারণ ঐ সমস্ত সর্ব্বথা বর্জ্জন আবশ্যক। নির্জ্জনে থাকিলে যদি মনে কামের উদ্রেক হয় তবে তক্ষণি বাহিরে আসিয়া সৎলোকের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতে হয় অথবা কায়িক-শ্রম-সাধ্য কাজ করিতে হয়।

ভগবানের এমন ইচ্ছা নহে যে, কামরিপু মানুষের মন হইতে একেবারেই লোপ পাউক্; কারণ তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টি কার্য্যই লোপ পাইবে; কিন্তু কাম প্রবৃত্তির ক্ষমতা এতই প্রবল যে, তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে উহার বিলোপ করিতে ইচ্ছা করিলেও যাহা একটু মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে তাহাতেই ভগবানের সৃষ্টিকার্য্য অব্যাহত থাকিবে। সুতরাং কামের ন্যায় দুঃসাধ্যরিপুর বিনাশ চেষ্টা করাই বিধেয়। চণ্ডীগ্রন্থে দেখা গিয়াছে, দৈত্যরাজ শম্ভু নিশম্ভু কর্ত্তৃক প্রেরিত, দেবী ভগবতীর বিরুদ্ধে একদল রক্তবীজ সেনা, যাহাদের একবিন্দু রক্ত ভূমিতে পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ সহস্র সহস্র রক্ত-

বীজের জন্ম হইত। এই কামরিপুকে সেই রক্তবীজের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

ষড়রিপুর দ্বিতীয়টীর নাম ক্রোধ। ক্রোধ কামের ন্যায় তত বলবান্ না হইলেও অন্যগুলির চেয়ে বেশী ক্ষমতাশালী; তাই ইহার নাম দ্বিতীয় স্থানে রাখা হইয়াছে। মানুষের রাগ হইলে তার ভাল মন্দ, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না—তখন সে যেন ঘোর উন্মাদ। অন্য সময়ে যে ব্যক্তি বেশ জ্ঞানী, সৎ-বিবেচক, বুদ্ধিমান, হিতাহিত-বিচারক্ষম, এরূপ ব্যক্তির ক্রোধ উপস্থিত হইলে ঐ সমস্ত গুণ, লয় পাইয়া উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠে। ক্রোধী ব্যক্তি অনায়াসেই নিজের প্রাণাধিক পুত্রকে হত্যা করিতে পারে, এমন কি, অনেক সময় আত্মহত্যাও করিয়া থাকে। এই আত্মহত্যা ব্যাপারে স্ত্রীলোক সমধিক পটু। গণনা দ্বারা জানা গিয়াছে আত্মহত্যাকারী পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণ কি ত্রিগুণ—ইহার কারণ এই, স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ অল্পবুদ্ধি, অভিমানিনী, চঞ্চল-প্রকৃতি ও অপরিণামদর্শী। তাহারা ভাবিয়া দেখে না যে, যে কাজ তাহারা ক্ষণিক উত্তেজনা বশে করিতে যাইতেছে, তাহার ফল, পরিণামে তাহারই পক্ষে অথবা তাহার প্রিয়তম সন্তানদের পক্ষে কত মন্দ হইবে। এবং যাহাদের উপর ক্রোধ কি অভিমান করিয়া এই চরম প্রতিহিংসা লইয়া নিজের জীবন উৎসর্গ করিতেছে, তাহাতে উহাদের কত দূর ক্ষতি ও নিজের কি পরিমাণ ক্ষতি। শাশুড়ী ননদের লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া স্ত্রী, রাত্রে স্বামীর নিকট নালিশ করিল, কিন্তু স্বামীর ঔদাস্যভাব দেখিয়া স্ত্রী আফিং খাইল কিম্বা কাপড়ে কেরাসীন তেল ঢালিল। কিন্তু তাও

বলি ;—অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে বধূর উপর এতধিক অত্যাচার হয় যে, ঐ হতভাগিনীর আত্মহত্যা ভিন্ন নিষ্কৃতি নাই ; যেহেতু পলাইয়া বাপের বাড়ী, কি অন্যত্র চলিয়া গেলেও, লোক-গঞ্জনা ও শেষে ধরিয়া আনিয়া অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি। যাহা হউক যে কোন হেতুতে, আত্মহত্যা-রূপ মহাপাপ করা কোন ক্রমেই উপযুক্ত নহে। অত্যাচার সহ্য করিয়া কিছু কাল নীরবে থাকিতে পারিলে, ভগবান্ সকল অত্যাচার দূর করিয়া থাকেন ; কিন্তু স্বয়ং কোন প্রকার প্রতিহিংসা লইতে গেলে, বেশী কষ্ট পাইতে হয়। কোন প্রকার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া পড়িয়া কিছু কাল গালি ও মার খাইতে পারিলে, অতি বড় শত্রুরও দয়া হইয়া থাকে ; তখন স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ যাহারা ইতঃপূর্ব্বে প্রবল অত্যাচারী ছিল তাহাদের মনে গ্লানি উপস্থিত হইয়া অতঃপর পরম দয়ালু হয়ে দাঁড়ায়—যেহেতু দুর্ব্বলের সহায়, অনাথের নাথ, ভগবান স্বয়ং সেই অত্যাচার নিবারণের সাহায্য করে থাকেন। অতএব নীরবে অত্যাচার সহ্য করিতে থাকো, প্রতিশোধ দিতে যাইও না ; ভগবান্ তোমার মঙ্গল নিশ্চয় করিবেন।

যা বলিতেছিলাম,—ক্রোধ দমন করাই কর্ত্তব্য। ইহা দমন চেষ্টা করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাতেই ক্রোধের মঙ্গল-জনক কার্য্য সংশাধিত হইতে পারিবে। কামের শুভফল যেমন বিধাতার সৃষ্টি রক্ষা তেমনি ক্রোধের ভাল কাজ হচ্ছে, আততায়ীর হাত হইতে আত্মরক্ষা, এবং দস্যু-তস্করের হাত হইতে অর্থবিত্ত রক্ষা, এবং বিজয়ী সেনার হাত হইতে স্বদেশ রক্ষা। আমাদের শরীরে ক্রোধ আছে বলিয়াই আমরা নিজ প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া স্বদেশ রক্ষা করিতে ছুটি, আর দস্যু-কর্ত্তৃক আক্রান্ত

পথিকের ধনপ্রাণ ও অসহায়া সতীর সতীত্ব রক্ষা করিতে স্বইচ্ছায় ধাবিত হইয়া থাকি।

ষড় রিপুর তৃতীয়টীর নাম লোভ। লোভের দোষগুণের কথা পূর্ব্বে কিছু বলা হ'য়েছে। আহারের লোভ, অর্থ বিত্তের লোভ, সুখের লোভ ইত্যাদি নানা প্রকার অন্যায় লোভ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত দুই রিপুর ন্যায় লোভেরও প্রশ্রয় পাইলে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; তখন ন্যায়-অন্যায় বিচার থাকে না। আহারের লোভে পশু পক্ষী ফাঁদে প'ড়ে জীবন হারায়, তেমনি অর্থবিত্তের লোভে দস্যু তস্করেরা জেলে গিয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করে। তবে সৎকার্য্যের লোভ, প্রশংসার লোভ ও পুণ্য-কার্য্য-জনিত নির্ম্মল আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ লাভের লোভ সর্ব্বদা কর্ত্তব্য; তাহাতে ক্রমে নিজের মনের উন্নতি হইতে থাকে। পাপে ঘৃণা ও পুণ্যে লোভ ইহাই স্বাভাবিক, কারণ, তাহার ফল নির্ম্মল আনন্দ ও সুখ। পরের জিনিষে লোভ হইলে তাহা ন্যায়রূপে হউক, কি অন্যায় রূপেই হউক, যে কোন প্রকারে আত্মসাৎ করিতে প্রবল ইচ্ছা হইলে, মানুষে চুরি ডাকাতির দ্বারা না লইয়া, যদি একান্ত চেষ্টা, কি পরিশ্রম দ্বারা সৎ উপায়ে নিজে উপার্জ্জন ক'রে লইতে পারে, তবেই এই লোভে তাহার উপকার হইল বলিতে হইবে। অতএব লোভ দ্বারা মনের মধ্যে নূতন বস্তু লাভের যে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, যাহার জন্য আমরা ঐ প্রকার লোভনীয় বস্তু উপার্জ্জন করিতে উৎসাহিত হই; ইহাই লোভের ভাল ফল। এই হেতু বালকেরা পুরস্কার-পুস্তকের লোভে পরীক্ষার জন্য প্রবল চেষ্টা করে থাকে।

ষড়রিপুর চতুর্থটীর নাম মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানতা। যে বস্তু

যথার্থ যাহা, তাহাকে সেইভাবে না বুঝিয়া, অন্য ভুলভাবে বোঝার নাম মোহ। যেমন চাক্‌চিক্য দেখিয়া এক খণ্ড কাচকে হীরক বলিয়া ভুল ধারণা করত বিশেষ যত্ন সহকারে সিন্ধুকে রাখা, এবং কেহ পাছে চুরি করে নেয় এই ভয়ে সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকা ও রাত্রে চৌকি দেওয়া। আবার কোন গতিকে ঐ হীরকরূপী কাচ খণ্ড নষ্ট হইলে কাঁদিয়া আকুল হওয়া ও শোকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করা। ইহাই মোহ। যেমন নাকি রাত্রে এক গাছা দড়ি দেখিয়া সর্প ভ্রমে ভয়ে আড়ষ্ট হওয়া। যেমন নাকি প্রদীপকে শীতল ও সুখকর জিনিস ভাবিয়া, পতঙ্গ তার মধ্যে উড়িয়া প'ড়ে মরে যায়। তেমনি এই সংসারকে আমরা সর্ব্বদা "আমার আমার" ভাবিয়া আসক্তি ও মমতা জন্মাইয়া পরিণামে কত কষ্টই পাইয়া থাকি! বস্তুতঃ এই প্রকৃত কথা কয় জনে ভাবিয়া থাকে যে, এই সংসার, ধনৈশ্বর্য্য, পুত্র কন্যা কিছুই আমার নহে। ভগবান্ কেবল সামান্য কয় দিনের জন্য ঘটনা চক্রে উহাদের সঙ্গে আমার মিলন সংঘটন করে দিয়াছেন। আবার এই মুহূর্ত্তেই তিনি পুনরায় বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারেন। কিন্তু আমি এই যথার্থ সত্য কথা না ভাবিয়া কাল্পনিক ভাবে বিভোর থাকি যেহেতু মোহ দ্বারা আমার যথার্থ জ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। বিশেষতঃ ঐরূপ মিথ্যা ভাবিয়া আমি যেন একটু "সুখ" পাই। ছোট শিশু যেমন তাহার লাল চুসিকাটীকে অতি উপাদেয় সুমিষ্ট খাদ্য জ্ঞানে অনবরত চুসিতে থাকে,—কোন রস পাইতেছে না, তবু সযত্নে আঁকড়াইয়া ধরিয়া চুসিতেছে, দৈবাৎ হাত হইতে নীচে পড়িয়া গেলে কিম্বা কেহ কাড়িয়া লইলে চীৎকার করিয়া কাঁদে—আবার চুসিবার

জন্য কাঁদে। সেইরূপ আমরাও এই সংসারের মোহ লইয়া বেশ একটু "সুখ" পাইতেছি।

কুকুর যেমন এক খণ্ড শুষ্ক হাড় মুখে লইয়া যেথানে সেথানে যায়, আর মাঝে মাঝে চাটে—উহাতে মাংসের লেশ মাত্র নাই, কত কেলে পুরাণো শুক্‌নো হাড়, তবু তাহা ছাড়িতে পারে না। চাটিতে চাটিতে জিভ্ দিয়ে রক্ত পড়ে, তবু চাটিয়া যেন একটু সুখ পায়। এই সুখটুকুই হচ্ছে মোহের ভাল ভাব; কারণ ঐ "সুখ টুকু" অর্থাৎ কল্পিত সুখ টুকু ভোগ করিতে না পাইলে মানুষ পাগল হয়ে যেত;—অথবা উদাসীন হয়ে সংসার ত্যাগ করে বনে গিয়ে বাস করিত সুতরাং ভগবানের সৃষ্টিকার্য্য লোপ পাইত; তাই তিনি মোহের সৃষ্টি ক'রে মানুষের দ্বারা এই ভুতের ব্যাগার খাটাইয়া লইতেছেন।

সূর্য্যের উদয় হইলে যেমন অন্ধকার দূর হইয়া সব জিনিস দেখিয়া প্রকৃত ভাবে চেনা যায়, যাহা ইতঃপূর্ব্বে অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাইতেছিল না; সেইরূপ, জ্ঞান হইলে সব মায়া-মোহ কাটিয়া গিয়া জিনিসের যথার্থ স্বরূপ চিনিতে পারা যায়। দড়িকে সাপ বলিয়া ভাবা যেমন মোহ, সেইরূপ আবার সাপকে দড়ি বলিয়া ভাবাও মোহ, কারণ এই উভয়রূপ ভুল ধারণাই অজ্ঞানতা-প্রসূত। আবার এই উভয় রকম ভুলে মানুষের প্রাণান্ত পর্য্যন্ত হইতে পারে,—একটা হচ্ছে বিষে, আর একটা ভয়ে! এই মোহ দূর করার জন্য কত মহাপুরুষ, কত চেষ্টা করিয়া শেষে সিদ্ধিলাভ করেছেন। রাজর্ষি জনক, বশিষ্ট, নারদ, বেদব্যাস, পরাশর, শুক-দেব, বুদ্ধদেব প্রভৃতি কয়েক জন মোহ-মুক্ত মহাপুরুষের নাম করা গেল।

তোমরা সংসার করো কিন্তু বুঝিয়া করো যে ইহা কেবল ফাঁকি যেন যাদু অথবা ইন্দ্রজাল। তোমরা সকলেই ভোজের বাজী দেখিয়াছ, যাহাতে বাজীকরেরা দর্শকের চক্ষে "মন্ত্রদ্বারা" ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয় (সাধারণ লোকের এইরূপ ধারণা) সে জন্য দর্শকেরা তাদের মিথ্যা কারসাজি ধরিতে পারে না। সুতরাং উহারা আমের আঁটি হইতে তখনি তখনি গাছ জন্মাইয়া ফল ধরাইতেছে। আবার ডিম হইতে তখনি তখনি বাচ্ছা ও পায়রা উড়াইয়া দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই সব কাজ মিথ্যা। সেইরূপ ধাঁধাঁ সংসারীর চক্ষে লাগিয়া রহিয়াছে।

ষড় রিপুর পঞ্চমটীর নাম হচ্ছে মদ। মাতালেরা যে মদ খেয়ে নেশা ক'রে থাকে এ সে মদ নহে। তাহার নাম হচ্ছে সুরা অথবা মদিরা। এ মদ মানে গর্ব্ব, অহঙ্কার, দম্ভ ইত্যাদি—যাহাতে মনে হয় যেন আমি ধনে, মানে, কুলে শীলে, জ্ঞানে, যশে, সমস্ত বিষয়ে অন্য সকলের চেয়ে বড়, আর সকলে আমার চেয়ে সব বিষয়ে নিকৃষ্ট সুতরাং তাদের কাছে আমার উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্য। অতএব তাহারা যদি আমাকে উপযুক্তরূপ মান্য না করে, তবে তাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া। দক্ষরাজা এইরূপ মদগর্ব্বে মত্ত হইয়া শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, যাহার ফল হয়েছিল সতীর দেহত্যাগ ও নিজের স্কন্ধে ছাগমুণ্ড—যাহা এরূপ বিভ্রান্ত মদমত্ত লোকের যথার্থ প্রাপ্য পুরস্কার!

যাহা হউক মদগর্ব্বিত লোকের সঙ্গে সকলেরই শত্রুতা জন্মে; যেহেতু তাহারা নিজেকে যত মাননীয় নিজেরা মনে করে, অপরে কখনই সেরূপ করিতে চায় না সুতরাং তাহারা পদে পদে অপদস্থ ও ক্ষুব্ধ হয়; একারণ অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া নম্র ও

বিনীত হইলে সকলের নিকট যেরূপ সম্মান লাভ করা যায়, জোর ক'রে সম্মান লইতে গেলে তার বিপরীত ফল হইয়া দাঁড়ায়। রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রাহ্মণদের পা ধুইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সম্মান বাড়িয়াছিল কি কমিয়াছিল? আবার মদ-গর্ব্বে গর্ব্বিত দুর্য্যোধন নিজকে অতি মানী মনে করাতে পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়েছিলেন। ঐ রাজসূয় যজ্ঞে আর একটী মদ-গর্ব্বের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যার ফল হয়েছিল শিরশ্ছেদ। ভীষ্মদেব কর্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্ঘ্য ও মাল্য-চন্দন-রূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইলে, ক্ষুদ্র চেদি-দেশের রাজা শিশুপাল, তাহার প্রতিবাদ করিয়া, নিজে ঐ সম্মানের উপযুক্ত পাত্র এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ অযোগ্য এইরূপ বক্তৃতা দিতে থাকিয়া, তাঁহার শত দোষ প্রদর্শন করিতে থাকায়, সভাস্থ সকলেই তাহাতে অসন্তুষ্ট হইতে থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ, সুদর্শন চক্রে শিশুপালের শিরশ্ছেদ করিয়া ঐ মূর্খ মদমত্তের যথাযোগ্য "সম্মান" প্রদান করেন!

ষড় রিপুর শেষটীর নাম মাৎসর্য্য যাহার অর্থ হচ্ছে পরশ্রী-কাতরতা। পরের শ্রী দেখিলে, কি সুখ্যাতি শুনিলে, কি পরের উন্নতির কথা জানিলে, কি অন্য প্রকারে কিছু ভাল হইতে দেখিলে, যদি নিজের মনে কষ্ট হয় তবে বুঝিবে মাৎসর্য্য দ্বারা তোমার মন বিষাক্ত হয়েছে! এই মাৎসর্য্য হেতু কেবল পরের দোষ অনুসন্ধান ও কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা হয়। এই হেতু সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা কয়েক জন একত্র মিলিত হইলে পরচর্চ্চা ও পরের সত্য-অসত্য দোষ আলোচনা করিয়া যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। কেহ বলিল "ওগো ও পাড়ার চাটুয্যেদের অবিনাশ ছেলেটী এ গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে ভাল লেখাপড়া করিতেছে।" অমনি অন্য একটী

স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল,—"হাঁ তা লেখা পড়া করুক বটে, কিন্তু পাশ করিতে হবে না।" কিন্তু কিছু দিন পরে যখন শোনা গেল অবিনাশ পাশ ত করেছে, আরো জলপানিও পেয়েছে। তখন পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোক কিম্বা সেই প্রকৃতির অন্য এক জন বলিয়া উঠিল—"হাঁ পাশ করুক তাতে কি? চাকুরি পাইতে হবে না।" তার পর কিছু দিন পরে উহার বেশ ভাল চাকরি হয়েছে বলে সংবাদ প্রচার হইলে, কোন কোন স্ত্রীলোক বলিয়া উঠিল, "চাকুরি হউক তাতে কি? কিন্তু বেতন পাইবে না।" তার পর প্রথম মাসের বেতন পাইয়া বেশ ভাল রকম সত্যনারায়ণ পূজা ও গ্রামের স্ত্রীপুরুষ নিমন্ত্রণ করা হইলে, খাইয়া বাড়ী আসার সময় সেই সেই স্ত্রীলোকেরা পথে বলাবলি করিতে লাগিল,—এই এক মাসের বেতন পাইয়াছে বটে কিন্তু আর পেতে হবে না, ও, শীঘ্রই মরে যাবে।" এখন কথা হচ্ছে—অবিনাশ কি তাহার মা বাপ এই স্ত্রীলোকদের কখনই কিছুমাত্র ক্ষতি করেন নাই বরং সময় সময় উপকার করে থাকেন; বিশেষতঃ যাহার কল্যাণে এই নিমন্ত্রণ খাওয়া তারই মৃত্যু কামনা! যেন ইচ্ছা হইতেছে, যে কোন প্রকারে তাহার অমঙ্গল শুনিতে পাইলে বাঁচিয়া যাই। তার অমঙ্গল জন্য যদি আমার কিছু ব্যয় লাগে তাও দিতে রাজি আছি। এরূপ সঙ্কীর্ণ মনের গতি হয় কেবল মাৎসর্য্য থাকা হেতু। অতএব স্ত্রী পুরুষ মধ্যে এরূপ ঘৃণিত মনোবৃত্তি সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

রাত্রে একজন লণ্ঠন জ্বালিয়া কর্দ্দমময় গ্রাম্য পথে যাইতেছে, এমন সময় অন্য আর একজন লোক ভীত ও ব্যস্ত ভাবে আসিয়া বলিয়া উঠিল,—"বাঃ ভগবান্ এ যাত্রা রক্ষা করেছেন, এক্ষণি সাপের ঘাড়ে পা দিয়া প্রাণ হারাইতেছিলাম;—থাক্ সে কথা,

এখন মহাশয় চলুন, একসঙ্গে আলোয় পথ দেখে যাওয়া যাউক।" তখন লণ্ঠনধারী একটু বিরক্তভাবে বলিল,—"মহাশয়ের গরজ থাকে অগ্রসর হউন, আমার এখন যাওয়া হবে না।" অর্থাৎ আসল কথা হচ্ছে—উহার আলোতে অন্য লোকের বিনা পয়সায় উপকার হইবে সেটা সে সহ্য করিতে চায় না, যেহেতু উহার মন মাৎসর্য্যপূর্ণ।

অন্যত্র দুইজন ভদ্র লোকের কথোপকথন একটু শুনিতে চাও? একজন অনাহারী ধূলিশায়ী ভদ্রলোককে, অন্য একটী আগন্তুক উপস্থিত হইয়া বলিল "ওগো তোমার একখান মাত্র চাউলের কিস্তী ঝড়ে মারা গেছে, তাতে বড় জোর হাজার দেড় হাজার টাকার মাল ছিল, সেই শোকে তুমি অনাহারে অনিদ্রায় শরীর পাত করিতে বসিয়াছ; আর আমি এইমাত্র খবরের কাগজে পড়িলাম, আড্ডিবাবুদের বত্রিস খানা চাউলের কিস্তী ও তাম্‌লি বাবুদের ১৮ খানা চিনির কিস্তী আর সাহাদের ২৫ খানা পাটের কিস্তী ও এই ঝড়ে ডুবিয়াছে; আরো কত জনের কত ক্ষতি হয়েছে ক্রমে শোনা যাবে।" তখন সেই শোকগ্রস্ত ধরাশায়ী ব্যক্তি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দ সহকারে বলিল,—"আঃ বাঁচলুম, ভাই আর কার কার কি রকমে কত ক্ষতি হয়েছে কাল আমাকে বলিও আমি তোমাকে সন্দেশ খাওয়াব' এই কথা বলিয়া সেই তিন দিনকার অনাহার-অনিদ্রাগ্রস্ত ব্যক্তি সানন্দে স্নানাহার করিতে গেল।

কথামালার গল্পে সকলেই পড়িয়াছে, এক ঘোড়াওয়ালা কিছু সময়ের জন্য অন্য এক ব্যক্তিকে তাহার ঘোড়াটী ভাড়া দিয়াছিল। ভাড়াকারী ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিল এবং ঘোড়াওয়ালা সঙ্গে

সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতে লাগিল। খানিক গেলে পরে, প্রচণ্ড রৌদ্রে অশ্বারোহী ক্লান্ত হইয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া, ঘোড়ার ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল, ইহা দেখিয়া ঐ ঘোড়াওয়ালা চীৎকার করিয়া উঠিল—"মহাশয়, শীঘ্র সরিয়া বসুন, আমি আপনাকে ঘোড়া ভাড়া দিয়াছি সত্য, কিন্তু ঘোড়ার "ছায়া" কখনই ভাড়া দেই নাই।" ইহাতে উভয়ের মধ্যে প্রথমে বাদ বিতণ্ডা, ক্রমে ঝগড়া, অবশেষে হাতাহাতি হইতে লাগিল। এই অবকাশে ঘোড়াটী ছাড়া পাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কিন্তু তাহাতে ঘোড়াওয়ালার কিছু মাত্র দুঃখ নাই, যেহেতু সে যে, বিনা পয়সায় অন্যকে ঘোড়ার ছায়া ভোগ করিতে দেয় নাই ইহাতেই সন্তুষ্ট।

মাৎসর্য্য দোষের প্রতিকার হচ্ছে—নিজের মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া মনকে উদারভাবাপন্ন করা। তোমার ভাবা উচিত সকলই তোমার আপন, কেহই তোমার পর নহে সুতরাং যে তোমার শত্রু নহে তাহার উন্নতিতে তোমার লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই সুতরাং তাহার মঙ্গল কামনাই তোমার কর্ত্তব্য। নীচ সঙ্কীর্ণ মনে ভগবানের ছায়া পড়ে না। অনন্ত মহাসমুদ্রবৎ যে ভগবান, তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিতে হইলে, নিজের মনের সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও নীচতা দূর করিয়া অসীম উদার হইতে হইবে,—যেন সমস্ত মানবমণ্ডলী, এমন কি পশু, পক্ষী, জীব, জন্তু, মাত্রকেই আপন ভাবিয়া তাহাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, হইতে হইবে। ইহাই ঈশ্বর-ভক্তির সূচনা।

সান্ত্বনা।

পূর্ব্বে কয়েক বার বলা হইয়াছে তবু, নিতান্ত দরকারী বলিয়া আর একবার বলা যাইতেছে যে, সংসারী জীবের পক্ষে এই পৃথিবীতে থাকিয়া আপদ বিপদ, দুঃখ কষ্টের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কিছুমাত্র উপায় নাই। ঐ সমস্ত আসিবেই আসিবে। নরদেহ-ধারী স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র এবং দেবতার আত্মজ পাণ্ডবগণ বনে বনে, কত কষ্টই না সহ্য করেছিলেন,—তুমি আমি কোন ছার! আবার দেখ বুদ্ধদেব, রাজ-পুত্র হইয়াও রাজ-সুখ, রাজ-সিংহাসন, প্রণয়িণী স্ত্রী, নবজাত শিশু সন্তান, সমস্তই ত্যাগ করিয়া স্বইচ্ছায় সন্ন্যাসী হয়ে বনবাস-ক্লেশ সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবেই দেখা যাইতেছে, রাজভোগে সুখ নাই—আবার বনবাসেও ক্লেশ নাই। রামচন্দ্রকে রাজসুখ ভোগ করার জন্য দেশশুদ্ধ লোক অনুরোধ করা সত্ত্বেও, তিনি বনবাস দ্বারা পিতৃ-সত্য-পালন করা অবশ্যই বেশী সুখকর ও তৃপ্তিদায়ক মনে করেছিলেন।

তবে তুমি দুঃখকষ্টে পড়িয়া বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হইবে কেন? আর ম্রিয়মাণ হইলেই বা দুঃখ কষ্ট তোমার উপর দয়া করিয়া তোমাকে অব্যাহতি দিয়া ছাড়িয়া পালায় কৈ? দুঃখ কষ্ট, রোগ শোক, আপদ বিপদ, যখন নিশ্চয় আসিবে জানিতেছি, তখন তাহাতে হত-বুদ্ধি না হইয়া, ধৈর্য্য-ধারণ পূর্ব্বক, প্রসন্ন-চিত্তে বর্ত্তমান কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হইবে। যথাসাধ্য প্রতিকার-চেষ্টা করিয়া ফলের আশা না রাখিয়া ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া

সব সহ্য করিতে হইবে। ইহাই বুদ্ধিমানের কাজ,—যেহেতু এর বেশী মানুষের ক্ষমতা নাই—তা তুমি রাজা হও, কি সম্রাট হও, কি ধনকুবের হও, কিম্বা ভিক্ষুক হও। সকলেরই একদশা; এই মাত্র প্রভেদ—পুত্র শোকে ধনীর মনে সান্ত্বনা এই—আমার ছেলে এ দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করিয়াও বাঁচিল না, যেহেতু ছেলের আয়ু নাই। আর গরীবের মনের সান্ত্বনা এই—আমার ছেলের আয়ু নাই, সুতরাং চিকিৎসা করাইলেও বাঁচানো যাইত না। এই ধনী ও দরিদ্র উভয়েই পুত্রশোকে তুল্যরূপে কষ্ট পাইল। এমত অবস্থায় সহ্যকরা এবং ভগবানের শুভ-উদ্দেশ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। উপরোক্ত পুত্র শোকাতুর ধনী এবং দরিদ্র যে মুহূর্ত্তে ভাবিবে, "ভগবান্ অবশ্যই কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য-সাধন জন্য আমার পুত্রকে লইয়াছেন," তখনি তাহাদের মনঃকষ্ট দূর হইয়া শান্তি পাইবে। তাহারা আরো যদি ভাবিতে পারে, "ঐ ছেলে বাঁচিয়া থাকিয়া বড় হইলে হয়ত পিতা মাতার বিষম কষ্টের কারণ হইত, তাই ভগবান তাহাদের উপর দয়া করিয়া সেই ভবিষ্যৎ কষ্টের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আজ ঐ ছেলেকে লইলেন; সুতরাং ছেলের মৃত্যুতে মঙ্গল হইয়াছে"। এইরূপ বিশ্বাস হইলে শোকে শান্তি পাওয়া যায়।

কোন অবস্থাতেই ভগবানের দয়া এবং মঙ্গল ইচ্ছার উপর সন্দেহ করিতে নাই। ভাবিবে আমার এই দুঃখ দেওয়াতে ভগবান অবশ্যই ভবিষ্যতে আমার কোন মঙ্গলের সূচনা করিতেছেন। কিন্তু তাহা আমি বুঝিনা বলিয়াই বর্ত্তমানে আমার এই কষ্ট অনুভব। পুত্রের দুর্ব্যবহারে শেষজীবনে সাহজাহান বাদসাহা

যে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রনা ভোগ করিয়াছিলেন,—সে সময়ে তিনি অবশ্যই নিয়ত মনে মনে ভাবিতেন, যদি এই পুত্রের বাল্যকালে মৃত্যু হইত তবে তাঁহার পক্ষে উহা নিতান্ত সুখের কারণ হইত; কিন্তু বাস্তবিক যদি আরাঙ্গজীবের বাল্যকালে মৃত্যু হইত তথন সাহাজাহান নিশ্চয়ই না কাঁদিয়া থাকিতে পারিতেন না; যেহেতু মানব অদূরদর্শী, অজ্ঞান জীব। বুঝিনা বলিয়াই আমরা অনেক সময় ভুল ধারণা করিয়া কষ্ট পাইয়া থাকি। এইরূপ প্রথমে দুঃখ দিয়া পরিণামে সুখের ব্যবস্থা ভগবান নিয়তই করিয়া থাকেন কিন্তু আমাদের জ্ঞান অতি সংকীর্ণ বলিয়া সব সময় তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বাতি জ্বালিয়া সূর্য্য দেখিতে চেষ্টা করার মত ভগবানের কাজের উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান করা, মানব পক্ষে প্রগাঢ় ধৃষ্টতা মাত্র। তবে ভগবানের প্রদত্ত সংকীর্ণ জ্ঞানের সাহায্যে কিছু কিছু জানিতে পারি। বালিকার বক্ষে স্তনের উদ্গম হইতে দেখিলে আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি, ভগবান্ ভাবী-সন্তানের আহারের সংস্থান করিতেছেন; কিন্তু তিনি চিত্র-বিচিত্র-সুন্দরদর্শন সর্প-মুখে এত তীব্র বিষ দিয়াছেন কেন, আবার কেনই বা মহামারী পাঠাইয়া এককালে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ-সংহার করিতেছেন তাহার সমাধান করা মানব বুদ্ধির অসাধ্য। যাহা হউক স্বল্প-জ্ঞান-সম্পন্না বালিকাদের বুঝাইবার জন্য ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্যের সামান্য দুই একটী দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাইতেছে।

বর্ষাকাল আসিলে অনেকেই বিরক্ত হইয়া থাকে; কারণ এই সময় নানা কারণে কষ্ট-জনক। ঘরের বাহির হওয়া যায় না, পথেও চলা যায় না, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের পথ-ঘাট গুলি কর্দ্দমে একেবারেই দুর্গম হইয়া উঠে। খাদ্যাদি কিছুই ভাল পাওয়া যায়

না। গরীবের পক্ষে শুইবার শুক্‌না স্থান টুকুও থাকে না। মাঝে মাঝে বন্যা আসিয়া গ্রাম ভাসাইয়া লইয়া যায়—কত ঘর ভাঙে, কত মানুষ গরু মরে, তার সংখ্যা নাই। সাপ অসংখ্য বাহির হয়—জোঁক মশার ত কথাই নাই। ম্যালেরিয়া জ্বর-বিকারে ও অন্য প্রকার মহামারীতে কতলোক মরে তার সংখ্যাই নাই সুতরাং ক্ষুদ্রদৃষ্টি-সম্পন্ন অজ্ঞান লোকে ভাবে, ভগবান্ পৃথিবীতে বর্ষাকাল পাঠাইয়া বড় নিষ্ঠুরের কাজ করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখে না যে, এই অশেষ-দুঃখ-জনক বর্ষাকাল দ্বারা ভগবান কি অসীম মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। ফল, শস্য, আদি দ্বারা জীবজন্তুর পরবর্ত্তী সম্বৎসরের আহারের সংস্থান এই বর্ষাদ্বারাই সংসাধিত হইয়া থাকে। বর্ষাকাল না আসিলে এই সোনার বাংলাদেশ মরুভূমি হইয়া মানব এবং সকল প্রকার জীব-জন্তুর বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইত। তখন এখানে কেবল অনন্ত বালুকারাশি ধু ধু করিত—বৃক্ষ-লতা-জন-প্রাণী কিছুই থাকিত না। এই উদ্ভিদ্-পরিপূর্ণ বাংলা দেশে একবছর ভাল করিয়া বৃষ্টিপাত না হইলে খাদ্য-দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠে; তাহার উপর আর এক বছর বর্ষা না হইলে একেবারেই দুর্ভিক্ষের হাহাকার—তাহাতে কত লোক অনাহারে এবং কত লোক অখাদ্য আহারে মরে তাহার সংখ্যাই নাই। তখন এই স্বল্পবুদ্ধি, বর্ষাজনিত-কষ্ট-বোধকারী লোকেরা বলিবে, "ভগবান্ বর্ষাকাল আনিয়া আমাদিগকে দ্বিগুণ কষ্ট দাও প্রফুল্ল বদনে সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু বর্ষার-অভাব-জনিত বিপদ সহ্য করিতে পারিব না।"

আবার দেখ, ফোঁড়া হইলে বালক বালিকারা ভাবে ভগবান্ নিদয় হইয়া তাহাদিগকে এই কষ্টে ফেলিয়াছেন কিন্তু একটী

বারও ভাবিয়া দেখে না যে, তাহাদের শরীরের বিষাক্ত পদার্থ এই ফোঁড়ার পুঁজের সহিত বাহির করিয়া দিয়া ভগবান্ তাহা-দিগকে স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ও নীরোগ করিলেন। ফোঁড়ার জন্য যে কষ্ট হইল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কষ্ট, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারিত ঐ বিষযুক্ত রক্ত শরীরে থাকিতে দিলে, সুতরাং প্রথমে সামান্য একটু কষ্ট ভোগ করিতে দিয়া, ভগবান আমাদিগকে বেশী কষ্টের হাত হইতে রক্ষা করিতেছেন। এইরূপ সমস্ত রকম পীড়া সম্বন্ধে, এমন কি মৃত্যু সম্বন্ধেও ভগবানের শুভ উদ্দেশ্যে সন্দেহ করিতে নাই,—যেহেতু আমরা নিজেরা অজ্ঞান বলিয়া তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু বুঝি আর না বুঝি তিনি যাহা যাহা করেন সমস্তই মঙ্গল-জনক, কারণ তিনি মঙ্গলময়, মঙ্গল-স্বরূপ এবং মঙ্গল-বিধাতা।

একটা কথা অনেক সময় অনেকের মুখে শোনা যায়,—"যা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে"। অর্থাৎ এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের যে অনন্ত-সৃষ্টি-কৌশল প্রকটিত আছে, সে সমস্তই ক্ষুদ্র আকারে এই নর-দেহে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই মনুষ্য-দেহে ভগবানের অনন্ত সৃষ্টি-কৌশল,—যে সমস্ত সুবিন্যস্ত যন্ত্র-রাজি যাহার একটু সামান্য মাত্র অংশ অযথা প্রদত্ত হয় নাই কিম্বা অযথা সংস্থাপিত হয় নাই—সকল গুলিই একযোগে এই জীবন-রক্ষা কার্য্য সুচারু-রূপে সংশাধিত করিতেছে,—যাহারা একটার অভাবে জীবন-যন্ত্র বিকল হয় এবং প্রধান একটীর অভাবে জীবন-যন্ত্র একেবারেই অচল হইয়া পড়ে—সেই সুনিপুণ, কার্য্য-কুশল, অনন্ত-জ্ঞান-সাগর ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দিহান হওয়া কম আস্পর্দ্ধার

কথা নহে। আমরা অতি মূর্খ, পাষণ্ড, অকৃতজ্ঞ, তাই এই অসীম পাপের কথার আলোচনা করিতেছি। ভগবান্ আমাদিগকে এই ধৃষ্টতা হইতে রক্ষা করুন এবং এই প্রবল পাপের ক্ষমা করুন।

আমরা সুখে, দুঃখে, কোন অবস্থাতেই ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় বিশ্বাস হারাইব না। সম্পদে, বিপদে, সমভাবেই ভগবানকে ডাকিব ও ভক্তি করিব। মহাত্মা তুলসী দাস বলিয়াছেনঃ—"দুঃখে পড়িলেই লোকে ভগবানকে ডাকিয়া থাকে কিন্তু সুখের সময় কেউ তাঁহাকে ডাকে না। কিন্তু আসল কথা এই, যাহারা সুখের বেলায় ভগবান্‌কে ডাকে, তাদের মোটেই যে দুঃখ আসে না, সে কথা কেউ ভাবিয়া দেখে না।" তাই বলি, সুখে দুঃখে সমভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে থাকিবে, তাহাতে বিপদ আসিবে না, কিম্বা আসিলেও স্থায়ী হইবে না। কিন্তু কোন সময়েই নিজের মনের বল এবং সহ্য করার ক্ষমতা হারাবে না; তাহাতে দেখিবে পরিণামে নিশ্চয় তোমার মঙ্গল হইবে এবং অচিরে দুঃখ কষ্ট সব দূরে পালাবে।

সান্ত্বনা পাইবার আর এক কথা—মানুষের সুখ-সম্পদ, দুঃখ কষ্ট সব পূর্ব্ব-জন্মের পাপ-পুণ্যের তারতম্য হেতু ইহ জন্মে ঘটিয়া থাকে। সুতরাং দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হইলে তুমি বিষণ্ণ না হইয়া বরং আনন্দিত হইবে, যেহেতু এই উপায়ে তোমার পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত পাপের খণ্ডন হইয়া গেল এবং অতঃপর তুমি নির্ম্মল পবিত্র নবজীবন প্রাপ্ত হইলে। পূর্ব্ব-জন্ম-কৃত পাপের ফল-ভোগ ইহ-জন্মে না ঘটিলে, উহার প্রায়শ্চিত্ত হইল না; সুতরাং উহা তোমার পিছু পিছু জন্ম-জন্মান্তর পর্য্যন্ত ধাবিত না হইয়া কিছুতেই ছাড়িবে না। এমত অবস্থায় যত শীঘ্র শীঘ্র গত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত

হইয়া, তোমার আত্মার সদ্গতি সাধিত হয় তাহাই শুভ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেমন, সোনাকে যত বেশীবার পোড়ানো যায়, ততই তার ময়লা দূর হইয়া ক্রমেই বেশী উজ্জ্বল হইতে থাকে ; যেমন, চন্দন-কাষ্ঠকে যত বেশী ঘষা যায় ততই তাহা বেশী সুগন্ধ বিস্তার করিতে থাকে। সেইরূপ মানব যতই দুঃখ-কষ্ট, আপদ-বিপদ ভোগ করিবে, ততই তাহার পূর্ব্ব জন্মের পাপের খণ্ডন হইয়া, ভাবীজীবন সুখের ও সম্পদের হইবার সূচনা করে। এই কারণেই পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, সুখের পরে দুঃখ এবং দুঃখের পরে সুখ যাওয়া আসা করে যেমন গাড়ীর চাকার অংশ-বিশেষ ভূমি-সংলগ্ন হইয়া পরক্ষণেই ঊর্দ্ধ দিকে তাহার গতি হয়।

এইরূপে দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে করিতে, জন্ম-জন্মান্তর-কৃত পাপের খণ্ডন হইয়া, নিষ্পাপ আত্মাই ভগবানে লীন হইবার সু-উচ্চ অধিকার লাভ করে—তখন আর পুনর্জন্ম হয় না। ইহাকেই মুক্তি বলে—যে মুক্তি লাভের জন্য কত মুনি ঋষিরা অনাহারে, অনিদ্রায়, বনে বনে তপস্যায়, জীবন-পাত করিতে থাকিয়া, কত কত জন্ম পরে, তবে সিদ্ধি লাভ করত মানব-জীবন সার্থক করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে বুঝিতে পারিলে, দুঃখ কষ্ট, আপদ বিপদ কিছুই আমাদের অমঙ্গল-জনক নহে ; বস্তুতঃ ঐ সমস্তই আমাদের আত্মাকে পাপশূন্য ও উন্নত করে।

সান্ত্বনা পাইবার সাপক্ষে আর একটী বিষয় বলা যাইতে পারে। "অদৃষ্ট" বলিয়া একটী কথা আছে যাহা অনেকেই মানিয়া থাকেন। "অদৃষ্ট" অর্থে প্রথমতঃ যাহা দেখা যায় নাই। ক্রমে এইরূপ অর্থ হইয়া দাঁড়াইল যে, যাহা দেখা যায় নাই, ভাবা

যায় নাই, অথচ মানুষের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু তাহা বিধাতা-পুরুষ শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই স্থিরীকৃত করিয়া কপালে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া থাকেন, যাহা মনুষ্যের ভাগ্যে পরজীবনে ঘটিবেই ঘটিবে ;—যাহা বিধাতা-পুরুষ একবার লিপিবদ্ধ করিলে আর তাহার পরিবর্ত্তন তিনি নিজেও করিতে পারেন না। সুতরাং সেই অনুসারে মানুষ সুখ দুঃখ ভোগ করিতে একান্ত বাধ্য। অতএব দুঃখ কষ্ট আসিলে, ভাবিবে ইহা তোমার কপাল-লিখিত বিধাতৃ-ব্যবস্থার ফল সুতরাং তুমি ভোগ করিতে বাধ্য। অতএব সে জন্য মনঃকষ্ট বোধ করা নিতান্তই বিফল ও অনুপযুক্ত।

মহাভারতীয় উদ্যোগ পর্ব্বে মদ্ররাজ শল্য, যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিবার প্রসঙ্গে বলিতেছেন ঃ—"হে যুধিষ্ঠির ! তোমরা এতকাল বনবাসে থাকিয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছ, সে জন্য মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ করিও না যেহেতু তোমাদের দুঃখ কষ্টের অবসান হইতে চলিল, অতঃপর তোমরা সুখ-সম্পদের অধিকারী হইবে। দেখ, এই সংসারে সকলই দৈবায়ত্ত। কি দুরাত্মা, কি মহাত্মা, সকলকেই সময় সময় দুঃখ-ভোগ করিতে হয়। অধিক কি, দেবগণও সময় ক্রমে যারপর নাই দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক স্বর্গচ্যুত ও বিতাড়িত হইয়া স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও শচী দেবীর সহিত অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। তৎপরে সুসময়ের আগমনে তিনি আবার পূর্ব্ব সুখসম্পদ ও স্বর্গরাজ্য সমস্তই লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তোমরাও সেইরূপ হৃত-সিংহাসন ও সুখসম্পদ অচিরে লাভ করিবে সুতরাং ক্ষোভ করিবার হেতু নাই"।

পতি-সেবা।

সনাতন হিন্দুশাস্ত্র মতে বিবাহ ও পতি-পত্নী-সম্বন্ধ অতি মহান্ ভাবব্যঞ্জক। ইহা পার্থিব ও শরীর সম্বন্ধে শেষ হয় না; পরন্তু ইহা পারলৌকিক ও আত্মার সম্বন্ধে দৃঢ়ীকৃত হইয়া জন্ম-জন্মান্তর পর্য্যন্ত অটুট থাকে। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সেই গুরুত্ব স্মরণ রাখিয়াই পতি-পত্নীর পরস্পরের আচরণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সমুদ্ররূপ হিন্দু শাস্ত্রে হাজার হাজার যায়গায় পত্নীকর্ত্তৃক পতিসেবার সাপক্ষে অনেক অনেক কথা বলা আছে, যাহা উদ্ধৃত করিতে গেলে একখানা প্রকাণ্ড পুস্তক হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এখানে মহর্ষি-মনু-প্রদত্ত কয়েকটী মাত্র অনুশাসন বাক্যের বাংলা অর্থ দেওয়া হইল।

তোমরা মনে করিও না, শাস্ত্র-লেখক পুরুষেরা পক্ষপাত করিয়া স্ত্রীলোকের দ্বারা পুরুষের দাসীত্বের বিধি দিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নহে। মহর্ষি মনু যেমন পুরুষের পক্ষে লিখিয়াছেন তিনি আবার স্ত্রীলোকের পক্ষেও সেইরূপ লিখিয়াছেন। অন্ধ-বিশ্বাসে না করিলেও বৈজ্ঞানিক হিসাবে অথবা স্বার্থ-অনুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায়, শারীরিক মানসিক শক্তিতে-ন্যূনতা-প্রাপ্ত, আত্মরক্ষায় অক্ষমা, সন্তান-পালনরতা, গৃহচারিণী নারী-জাতির পক্ষে পুরুষের সেবা করা,—তাহাকে সন্তুষ্ট রাখা এবং তাহার কায়িক-শ্রমলব্ধ-দ্রব্য-জাতের ভোগ করা, নারীর পক্ষে স্বাভাবিক; যেহেতু তাহা না করিয়া নারীর পক্ষে জীবন-ধারণের অন্য সহজ উপায় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে শাস্ত্রকারেরা পক্ষপাত করিয়া কিম্বা ফাঁকি দিয়া নারীদ্বারা পুরুষের

সেবা করিবার বিধি দেন নাই। অসভ্য-জাতি-মানব, এমন কি মানব ভিন্ন পশু-পক্ষী-ইতর-জন্তু, যাহাদের মধ্যে বিবাহপ্রথা নাই, শাস্ত্রবিধি নাই, নীতি নাই, যাহারা একমাত্র প্রকৃতিগত বৃত্তিদ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই দেখা যায়, স্ত্রী-পুরুষে জোড়ায় জোড়ায় এক সঙ্গে বিচরণ করে, এবং বিপদ-কালে পুরুষটীই নিজ স্বাভাবিক শক্তি-সামর্থ্যের-আধিক্য-বশতঃ শত্রুর সম্মুখীন হইয়া থাকে এবং স্ত্রীটী পশ্চাতে থাকিয়া তাহার সাহায্য করিতে থাকে। সুতরাং সুসভ্য মানব-পক্ষেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। পুরুষে বাহিরে থাকিয়া কষ্ট করিয়া খাদ্য-সংগ্রহ করিবে, আর স্ত্রী, ঘরে বসিয়া রন্ধন করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করত স্বামী-পুত্রকে দিবে এবং নিজেও আহার করিবে। ইহাই স্বভাবের নিয়ম। পুরুষ ভিন্ন নারীর স্বাবলম্বিত-ভাবে জীবন-যাপন অতি কঠিন সুতরাং সেবা দ্বারা তাহাকে সুস্থ, সবল ও সন্তুষ্ট, রাখাই নারীর পক্ষে স্বাভাবিক। ইহার বিপরীত করিতে গেলে, নারীর পক্ষে নিজেরই স্বার্থ-হানি ও নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু উপরোক্ত আধুনিক পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন বৈজ্ঞানিক মত, হিন্দু শাস্ত্রকারগণ, নীচ ও ঘৃণিত বলিয়া উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ এই আদান-প্রদান-রূপ ব্যবসাদারি, সংকীর্ণ, পার্থিব-দাম্পত্য সম্বন্ধের অনেক উচ্চে যে আধ্যাত্মিক, স্বর্গীয়, দাম্পত্য-সম্বন্ধ, তাহাই হিন্দু-গার্হস্থ্য-জীবনের সুখ-শান্তির মূল ভিত্তি। এই হিন্দু-দাম্পত্য-পদ্ধতি জগতের মধ্যে হিন্দুকে বিশেষরূপে স্বতন্ত্র রাখিয়া প্রকৃত-সুখশান্তি লাভের অধিকারী করিয়াছে—যে সম্বন্ধ, ইহকাল-পরকাল এবং জন্ম-জন্মান্তর পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়া হিন্দুরা বিশ্বাস করেন।

(১) পতিই স্ত্রীলোকের একমাত্র বন্ধু, পতিই তাহার রক্ষক, পতিই দেবতা, পতিই গুরু। স্বামীর চেয়ে বড় স্ত্রীলোকের পক্ষে আর কেহই নাই।

(২) যে গৃহে স্বামী স্ত্রীর প্রতি সদা প্রসন্ন, এবং স্ত্রীও স্বামীর প্রতি সদা সন্তুষ্ট থাকেন, তথায় চির-মঙ্গল বিরাজ করে।

(৩) পতি-সেবাই নারীর একমাত্র ব্রত, পতি-সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং পতি-সেবাই দেব-পূজা।

(৪) পত্নী, ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা থাকিবেন। সদা পবিত্র থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবেন, সখীর ন্যায় সহচরী হইবেন ; এবং যাহা তিনি আদেশ করেন তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিবেন।

(৫) যে স্ত্রী, পতির প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচার ও ইন্দ্রিয় সংযম করেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে সুখ ভোগ করেন।

(৬) পতিব্রতা নারী, নিজেকে ধর্ম্ম বলের দ্বারা নিজে রক্ষা না করিলে, কেহই তাঁহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রক্ষা করিতে সক্ষম নহেন।

(৭) স্বামী নিদ্রা গেলে যিনি নিদ্রা যান, স্বামী জাগিবার আগেই উঠেন, স্বামীর ভোজনের পরে আহার করেন, স্বামী নীরব থাকিলে কথা কন না, স্বামী দাঁড়াইলে উঠিয়া দাঁড়ান, স্বামীকে সর্ব্বদা সম্মুখে অথবা মনোমধ্যে দর্শন করেন, যিনি স্বামী-গত-প্রাণ, যিনি সতত স্বামীর আজ্ঞা পালন করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন এবং জগতে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে।

(৮) যে গৃহে নারী পূজিতা হন তথায় দেবতার অধিষ্ঠান হয়; কিন্তু যথায় নারী অনাদ্রিতা তথায় দেবপূজা নিষ্ফল হয়।

(৯) যে গৃহে ভার্য্যা ভর্ত্তার প্রতি এবং ভর্ত্তা ভার্য্যার প্রতি সন্তুষ্ট ও অনুরক্ত, সেই গৃহের কল্যাণ সুনিশ্চিত।

(১০) স্বামীর চিত্তরঞ্জন ও মন-আকর্ষণ বিষয়ে যে নারী যত পারদর্শিনী, তিনি তত বুদ্ধিমতা। আর যে নারী অভিমানিনী হইয়া কথায় কথায় স্বামীর বিরক্তি উৎপাদন করে, সে তত বুদ্ধিহীনা। মূর্খ ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোকেই স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া নিজের সুখশান্তির বিলোপ ঘটায়;—ইত্যাদি বহু উপদেশ হিন্দু শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

পতির নিন্দা শুনিয়া সতীর দেহত্যাগ, রাজ-সুখ-ভোগ-ত্যাগ করিয়া পতিসহ সীতার বনগমন, সাবিত্রী দেবীর দ্বারা মৃতস্বামীর পুনর্জ্জীবন লাভ ও শ্বশুরের রাজ্যলাভ ও অন্ধত্ব-মোচন, দময়ন্তী ও চিন্তাদেবীর স্বীয় স্বীয় স্বামীসহ বনগমন, স্বামিগণ সহিত দ্রৌপদীর বনবাস ক্লেশ সহ্য করার কথা সকলেই জানে সুতরাং এ স্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মহাভারত গ্রন্থে এইরূপ আরো শত শত পতিব্রতার পতিসেবার দৃষ্টান্ত দেখা যায় যাহা তোমরা নিজেরাই পাঠ করিয়া জ্ঞাত হইবে।

উপরোক্ত মহিয়সী মহিলাগণ সকলেই পশ্চিম ভারতের কন্যা হিসাবে পূজিতা ও প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছেন বটে, কিন্তু তোমাদেরই মত এই বাংলাদেশের একটী বাঙ্গালী মেয়ে কি করিতে পারিয়াছিলেন তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বিবাহ-রাত্রে বাসর ঘরে সর্পাঘাতে স্বামী লক্ষ্মীন্দ্রের মৃত্যু হইলে বিবাহ সাটী ও অলঙ্কারে ভূষিতা সদ্য-বিবাহিতা বধূ, বেহুলা কি করিলেন? তিনি লাল

বর্ণের পট্টসাটী খুলিলেন না, কিম্বা অঙ্গের অলঙ্কারও মোচন করিলেন না, অথবা সিঁথির সিন্দুরও মুছিলেন না। তিনি সেই অবস্থায়, সেই বেশে, দৃঢ় মনের বলের সহিত, মৃত স্বামীকে কোলে করিয়া ভেলায় চড়িয়া, কত নদ-নদী বাহিয়া বাহিয়া, দেশ-দেশান্তরে গিয়া উপযুক্ত সর্প চিকিৎসকের সাহায্যে মৃতস্বামীর পুনর্জ্জীবন লাভ করত স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ভগবান্ অনাথা, নিঃসহায়া নিরাশ্রয়ার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার দৃঢ়া-পতি-ভক্তির পুরস্কার স্বরূপ মৃত-স্বামীর প্রাণদান করিলেন! সতীত্বের জয়জয়কার হইল। পুরাণবর্ণিত সাবিত্রী-বৃত্তান্ত অপেক্ষা বেহুলা-উপাখ্যান কোন অংশে কম বিস্ময়প্রদ নহে—বিশেষতঃ বেহুলা, তোমাদেরই মত একটী সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে মাত্র। এই বেহুলার কীর্ত্তিগাথা সেকালে অর্থাৎ শত-বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে "বেহুলার ভাসান" নামক পাঁচালী গীত হইত। আর, ভেলায় চড়িয়া স্বামীর শবদেহ কোলে লইয়া ভাসিয়া ভাসিয়া যাইবার পথে, বেহুলা কত বিপদে পড়িয়াছিল, কত কষ্টই সহ্য করিয়াছিল, তাহার বর্ণনা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ কাঁদিয়া আকুল হইত! রুষ-দেশীয় প্রাস্কোভিয়া নাম্নী যুবতী, নিজ নির্ব্বাসিত পিতামাতার উদ্ধার কল্পে বহু দূরস্থিত রাজধানীতে রাজসমীপে যাইবার বিপদ-সঙ্কুল দুর্গম-পথে, কত কষ্ট সহ্য করিয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত আজকালকার স্কুলের ছেলে মেয়েরা পড়িয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু নিজের ঘরের মেয়ে বেহুলার এই স্বামী-সঞ্জীবন আশ্চর্য্য উপাখ্যান কয়জনে জানিতে ইচ্ছা করে?

যাদু, মন্ত্র, ঔষধ ইত্যাদি গুপ্ত-উপায়ে, স্বামীকে বশীভূত করার চেষ্টা একশত, দেড়শত বছর পূর্ব্বে এদেশে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল

অদ্যাপি আসাম, কুচ-বিহার ও ভারতের মধ্য-প্রদেশের স্ত্রীলোকে ঐ কৌশলে অবাধ্য, অবিশ্বাসী স্বামীকে বশ করিতে যাইয়া অনেক সময়, স্বামী-সোহাগিনী না হইয়া স্বামী-ঘাতিনী হইয়া দাঁড়ায়। যাহোক্ মহাভারতের আমলেও ঐ কুপ্রথা অল্প বিস্তর প্রচলিত ছিল তাহা মূল মহাভারতের (কাশীদাসী মহাভারতে নহে) বন-পর্ব্বের মধ্য-ভাগে দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ পাঠে জানিতে পারা যায়। ঐ উপাখ্যান পাঠে আরো জানিবে যে, যে প্রকারে, ন্যায় ও ধর্ম্ম সঙ্গত উপায়ে স্বামীকে বশীভূত করা যায় সেইরূপ উপদেশ দ্রৌপদী, সত্যভামাকে দিতেছেন ; ঐ উপাখ্যান অতি সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইল।

শ্রীকৃষ্ণের আটজন প্রধানা মহিষীর মধ্যে রুক্মিণী দেবী সর্ব্বাপেক্ষা রূপবতী, গুণবতী ও বুদ্ধিমতী সুতরাং স্বামীর বিশেষ প্রিয়পাত্রী ছিলেন। ঈর্ষান্বিতা হইয়া তাঁহার অন্যতমা সপত্নী সত্যভামা দেবী দ্রৌপদীর, শরণাপন্না হইয়া তাঁহার নিকট স্বামী-বশীকরণ মন্ত্রৌষধ প্রার্থনা করেন, যাহার গুণে দ্রৌপদী পাঁচ জন বিভিন্ন প্রকৃতির বীর স্বামীকে নিজের আজ্ঞানুবর্ত্তী করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন। তদুত্তরে দ্রৌপদী বলিলেন, "ভগিনি! আমি কোন যাদু-মন্ত্র, কি ঔষধ আদি জানিনা যাহা দ্বারা স্বামী বশ করা যায়, আর জানিলেও তাহা কদাচ প্রয়োগ করিতাম না ; যেহেতু এইরূপ করিয়া ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোকে অনেক সময় স্বামীর জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট, কি স্বামীকে চিরকালের মত পাগল, কি অন্ধ করিয়া ফেলে। আমার পাঁচজন বিভিন্ন প্রকৃতির বীর স্বামীকে, তাঁহাদের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে সেবা করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া থাকি। আমি কাম ক্রোধ অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক তাঁহাদের

পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। কটু কথা বলিনা, অভিমান করিনা, দ্রুত পদসঞ্চারে চলিনা কিম্বা কুৎসিতভাবে উপবেশন করিনা। তাঁহারা স্নান ভোজন বা উপবেশন না করিলে আমি খাইয়া বসিনা কিম্বা শয়ন করিনা। তাঁহারা দূরদেশ হইতে গৃহে আগমন করিলে স্বাগত-প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা, ব্যজন এবং পদপ্রক্ষালনের জল লইয়া প্রস্তুত থাকি। গৃহমার্জ্জন, পাক ও ভোজ্যদান অতি যত্নের সহিত করিয়া থাকি, যাহাতে তাঁহাদের তুষ্টি হয়। ভাণ্ডার-রক্ষা এবং সঞ্চিত-দ্রব্যজাত যাহাতে অপচয় না হয় তৎপক্ষে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখি। স্বামীরা যাহা ভোজন করেন আমি তাহাই খাই, যাহা তাঁহারা না খান তাহা আমিও খাই না। তাঁহাদের ইচ্ছামত বসনভূষণ পরি, কদাচ চাহিয়া লইনা। শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও স্বামীর আত্মীয়গণকে অন্ন-বস্ত্র-প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট রাখি। স্বামী বিদেশে গেলে, বিলাস ত্যাগ করে থাকি। কদাচ উচ্চহাস্য করিনা কিম্বা মন্দ স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করিনা। দ্বারদেশে স্বামীর পদশব্দ শুনিলে ছুটিয়া গিয়া অভ্যর্থনা করি। তিনি কোন কাজের জন্য দাসীকে অনুজ্ঞা করিলে, সেই কাজ আমি নিজে ছুটিয়া গিয়া করি। কদাচ আলস্য পরায়ণ হইনা। স্বামীর কোন কথা, (বিশেষ গোপনীয় বলিয়া অপরকে বলিতে স্পষ্টভাবে নিষেধ না করিয়া দিলেও), আমি কাহাকেও বলিনা। ইত্যাদি ইত্যাদি।"

(লেখকের মন্তব্য :—নিম্নে উদ্ধৃত পাঁচটী কবিতার রচয়িতার নাম না জানা থাকায় উল্লেখ করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইতেছি। যাহোক ঐ অজ্ঞাতনামা কবিদের নিকট এবং কবি-মানকুমারী ও কবি কালিদাস রায়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইতি)

পতিব্রতা দেবী মহাশক্তি তৎসম্বন্ধে কবিতা (অজ্ঞাতনামা কবি।)

"নয়নে তোমার জ্বলিছে আগুন, আননে মুখর দীপ্তি।
বক্ষে দুলিছে রক্ষ-মালিকা হৃদয়ে প্রসন্ন তৃপ্তি॥
সারা ধরাময় দিতেছে অভয়, মনেতে অসীম শক্তি।
পাষণ্ড পামর কাঁপে থর থর, মা বলে করিবে ভক্তি॥
যদি একাকিনী ভাবিও সতত, ভগবতী তব সঙ্গে।
যদিচ অবলা মনে রেখো তবু, মহাশক্তি তব অঙ্গে॥"

* * * *

পতিসেবার উপযোগিতা সম্বন্ধে মহাভারতের অনেক স্থানে অনেক কথা বলা হইয়াছে; তন্মধ্য হইতে বনপর্ব্বের অন্তর্গত মার্কণ্ডেয় সমস্যা নামক অধ্যায়ে কৌশিক উপাখ্যান এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত করা গেল:—বেদাধ্যয়ন-পরায়ণ প্রগাঢ় তপোবল-সম্পন্ন কৌশিক নামে এক ব্রাহ্মণ একদা কোন গৃহস্থের বাটীতে ভিক্ষার্থে উপস্থিত হইলে, গৃহিণী তাঁহাকে ভিক্ষা দিতে যাইবেন এমত সময়ে দেখিলেন, তাঁহার স্বামী ক্ষুধাতুর হইয়া বাটীতে উপস্থিত হইলেন। অমনি তিনি ভিক্ষা-প্রদান-কার্য্য হইতে বিরত হইয়া, সর্ব্বাগ্রে স্বামীকে পাদ্য, আচমনীয়, আসন ও বিবিধ সুমধুর ভক্ষ্য দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করত পরিতুষ্ট করিয়া, তৎপরে সেই ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দিতে গেলেন। ঐ কামিনী প্রত্যহ ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট ভোজন, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান, ও কায়মনোবাক্যে শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করিতেন এবং সদাচার-সম্পন্ন, শুচি, দক্ষ ও কুটুম্ব-হিতৈষিণী ছিলেন। সতত সংযতচিত্তে, দেবতা, অতিথি, ভৃত্য শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করিতেন।

সে যাহা হউক, গৃহিণী ভিক্ষা দিতে আসিলে, ভিক্ষার্থী কৌশিক

বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া, কোপাবিষ্ট মনে বলিলেন "তুমি কি কারণে লুব্ধ-আশ্বাস দিয়া এতক্ষণ আমাকে বৃথা দাঁড় করাইয়া রাখিয়া কষ্ট দিয়াছ? ইহা অপেক্ষা বরং পূর্ব্বেই আমাকে বিদায় করিয়া দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য ছিল।" পতিব্রতা গৃহিণী, ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণকে কোপাবিষ্ট দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করত কহিতে লাগিলেন,—"আমি স্বামীকে পরম দেবতা জ্ঞান করিয়া থাকি, একারণ তিনি শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হইয়া বাড়ীতে আসাতে অগ্রে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতেছিলাম সুতরাং ভিক্ষা দিতে বিলম্ব হইয়াছে, তজ্জন্য আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।"

তখন কৌশিক বলিলেন:—"যে ব্রাহ্মণকে, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র পর্য্যন্তও প্রণাম করিয়া থাকেন, যে ব্রাহ্মণ, ইচ্ছা করিলে তপোবলের দ্বারা পৃথিবী ভস্ম করিতে সক্ষম, তুমি গৃহস্থ-ধর্ম্মে থাকিয়া সেই ব্রাহ্মণকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, স্বামীকেই গুরুতর বিবেচনা করিলে? নিশ্চয়, তুমি জ্ঞানী বৃদ্ধের নিকট জ্ঞানশিক্ষা প্রাপ্ত হও নাই।

তখন সেই গৃহিণী বলিলেন:—"হে বিপ্র! আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন; ব্রাহ্মণের দেব-তুল্য মনস্বিতা, অসীম শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্নতা, দয়াদাক্ষিণ্যাদি অনন্ত মহিমা এবং অসাধারণ তপোবল, যদ্দ্বারা তাঁহারা মনুষ্যের অসাধ্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে সক্ষম,— সে সমস্তই বিশেষরূপে আমার জানা আছে এবং আপনি যে পিতা-মাতাকে শোকে কাতর রাখিয়া, বিদেশে অধ্যয়ন করিতে আসিয়া, তপঃপ্রভাবে একটী নিরীহ পক্ষীকে ভস্মসাৎ করিয়াছেন, তাহাও আমার অবিদিত নাই। কিন্তু আমার মতে, পতি-শুশ্রূষাই সর্ব্বা-পেক্ষা প্রধান কর্ম্ম এবং নারীর নিকট ভর্ত্তা, সমুদায় দেবগণ

অপেক্ষাও প্রধান, সুতরাং আমি অবিচলিত ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকি,—যে পুণ্যফলে আমি আপনার চরিত্রের গুপ্ত বিষয়গুলি পরিজ্ঞাত হইয়াছি। আমি আপনাকে উপদেশ দিতেছি, আপনি মিথিলানগরে গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মব্যাধের নিকট পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি সম্বন্ধে সৎ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া নিজ পিতামাতার তুষ্টি-সম্পাদন করত মানব-জীবন তথা শাস্ত্রজ্ঞান ও তপোবল সার্থক করুন।”

জ্ঞান-গর্ব্বিত, তপোবল-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কৌশিক, পতিব্রতার অসীম ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, লজ্জ-বিনম্র-মুখে ত্বরায় মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় ধর্ম্মব্যাধের নিকট জনক-জননীর ভক্তি ও সেবাশুশ্রূষার যথোচিত সৎউপদেশ লাভ করিয়া বাটী-প্রত্যাগমন করত পিতামাতার পরিতোষসম্পাদন করিতে লাগিলেন।

সু-ভার্য্যা হইয়া গৌরব-লাভ করিবার লক্ষণগুলি যাহা চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন তাহা বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য নিম্নে দেওয়া হইল। ভরণ-পোষণ দ্বারা পালন করিতে হয় বলিয়া “স্ত্রীকে” ভার্য্যা বলা হইয়া থাকে :—

সা ভার্য্যা যা শুচির্দক্ষা, সা ভার্য্যা যা প্রতিপ্রাণা।
সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী, সা ভার্য্যা যা প্রিয়ংবদা॥

অর্থাৎ তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা নামের উপযুক্তা, যিনি শরীর, মন সর্ব্বদা নির্ম্মল রাখিয়া নিষ্পাপ থাকেন; যিনি গৃহ-কার্য্যে সর্ব্বতো-ভাবে সুনিপুণা, পতির জীবনের সঙ্গে জড়িত যাঁর জীবন, যিনি সন্তান প্রসব করিয়া ভগবানের সৃষ্টিরক্ষার সহায়তা করিয়াছেন ও নিজে পরম গৌরবান্বিত মাতৃ-নাম ধারণের যোগ্যা হইয়াছেন এবং

যিনি মধুর বাক্য প্রয়োগে সকলের প্রিয়পাত্রী হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

* * * *

সতীত্ব অমূল্য নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমনি রতন।
পতির চরণ-ধূলি পেয়ে সোনায় করে হেলা।
এমন সতীর পা দুখানি পূজি সকাল বেলা॥

(অজ্ঞাত নামা কবি।)

* * * *

পতিব্রতা নারী "মানবী" নহে—"দেবী" ; তৎ সম্বন্ধে কবিতা।

(অজ্ঞাত নামা কবি।)

পতিব্রতা চলিয়াছে কোন মহাপথে।
উজ্জ্বল পবিত্র-ভরা স্বর্ণময় রথে॥
চরণ-ধূলার তলে লুটাইব শির।
পরাণে জাগিয়া উঠে কি ভাব গম্ভীর॥
আদর্শ রমণী, তুমি জগতে অতুল।
জগতে দেখিনা কিছু তব সমতুল॥
ধন রত্ন দূরে ফেলি, পবিত্র অন্তরে,
চলিয়াছ স্বামী-তীর্থে জনমের তরে॥
জগতে শিখায়ে দাও পতিব্রতা নারী—
"নারী" নহে "দেবী" সে যে নারী-রূপ ধরি॥"

* * * *

"সাধ্বীস্ত্রীদিগের আচরণ ও লক্ষণ কিরূপ," রাজা যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেব যাহা বলিয়াছিলেন, যাহা মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের শেষ ভাগে লিখিত আছে, তাহা বালিকাদের অবগতি জন্য এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—পতি-পরায়ণা সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞা শাণ্ডিলী দেবী স্বর্গে সমারূঢ়া হইলে, দেবলোক-নিবাসিনী সুমনা, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; দেবি! তুমি কিরূপ সুশীলতা ও সদাচার দ্বারা সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, অনল-শিখা ও চন্দ্রপ্রভার ন্যায় সমুজ্জ্বল-কলেবরে এই সুরলোকে সমুপস্থিত হইলে? তোমাকে দিব্য বস্ত্রধারণ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে বিমানোপরি অসাধারণ তেজঃপ্রকাশ করিতে দেখিয়া বোধ হইতেছে, সমধিক তপস্যা, দান, বা ব্রত-নিয়মদ্বারা তোমার এই স্বর্গবাস সম্ভব হইয়াছে, অতএব আমার নিকট তোমার গত সৎকার্য্য সমস্তের বর্ণনা করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর।

চারু-হাসিনী শাণ্ডিলী দেবী, সুমনার মধুর বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিলেন :—দেবি, আমি শিরো-মুণ্ডন বা জটাধারণ অথবা গৈরিক বসন বা বল্কল পরিধান করিয়া তপস্যা করি নাই—আমি কেবল পতি-সেবার দ্বারাই এই বাঞ্ছিত দেবলোক লাভ করিয়াছি। আমি আজীবন ভর্ত্তার অহিতকর বা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করি নাই। সর্ব্বদা একমনে দেবতা, পিতৃলোক, ও ব্রাহ্মণের পূজা করিতাম এবং ভক্তিপূর্ব্বক শ্বশুর শাশুড়ীর সেবায় তৎপর থাকিতাম ; এবং কখনই আমার মনে কুটিল ভাবের আবির্ভাব হয় নাই। আমি কদাপি বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া অপরিচিত ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইতাম না কিম্বা প্রকাশ্যে কি গোপনে কোন অহিতকর কি অন্যায় কার্য্য করিতাম না।

ভর্ত্তা, স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে, যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক আসন ও পাদ্য প্রদান করিয়া শ্রান্তিদূর করিতাম। যে সমুদায় খাদ্যদ্রব্য তিনি ভাল বাসিতেন না, তাহা আমিও ত্যাগ করিতাম। সন্তানগণ ও পরিজনবর্গের প্রতি আমার যে সমস্ত কর্ত্তব্য ছিল তাহা অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া যথোচিত যত্ন-সহকারে সম্পাদন করিতাম এবং কদাচ আলস্যে কাল-হরণ করি নাই।

আমার পতি কোন কার্য্য উপলক্ষে বিদেশ গমন করিলে, আমি সেই সময়ে কদাচ কেশ-সংস্কার কিম্বা গন্ধ-মাল্য-অঞ্জনাদি বিলাস-দ্রব্য ব্যবহার করি নাই। স্বামী নিদ্রিত থাকিলে আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতাম না, কারণ, জাগরিত হইয়া কি জানি কি দ্রব্যের তাঁহার আবশ্যক হইতে পারে। পরিবার প্রতিপালন নিমিত্ত সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত করিতাম না। স্বামীর গোপনীয় কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতাম না। নিরন্তর গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতাম। হে দেবি! যে নারী সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম পালন করেন তিনি নিশ্চয়ই অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে পরম সুখ-সম্ভোগে সমর্থা হন।"

উপরোক্ত সুমনা-শাণ্ডিলীর কথোপকথনের আরো কিছু পরে ঐ অনুশাসন-পর্ব্বে, পার্ব্বতী-মহেশ্বর কথোপকথন আছে, যাহাতে প্রসঙ্গ-ক্রমে মহেশ্বর, স্ত্রী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন:—"দেবি! তুমি ধর্ম্ম-বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছ, তুমি সাধ্বী, সুকেশী, কার্য্যদক্ষা, শান্তিগুণযুক্তা ও ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরতা। তুমি সমস্ত দেবীদিগের সৎগুণ সকল আয়ত্ত করিয়াছ। তুমি

ভূমণ্ডলস্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান-নিরতা কামিনীগণের আদর্শ-চরিত্রা, অতএব তুমি স্ত্রী-ধর্ম্মের বিষয় যেরূপ বর্ণন করিবে, সমস্ত স্ত্রীজাতি, অবিচলিত-চিত্তে তাহাই গ্রহণ এবং পালন করিতে থাকিবে।"

তখন পার্ব্বতী দেবী সুমধুর বাক্য-বিন্যাস পূর্ব্বক মহেশ্বরকে বলিতে লাগিলেন:—"হে দেবাদিদেব! আমি গঙ্গা ও অন্য দেবীদিগের নিকট স্ত্রীধর্ম্ম বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহাই আপনাকে নিবেদন করিতেছি:—পিতা মাতা প্রভৃতি বন্ধুবর্গের অনুমতি-ক্রমে অগ্নিসাক্ষী করিয়া উপযুক্ত পাত্রে পরিণীতা হওয়া কামিনীগণের প্রধান ধর্ম্ম। যে স্ত্রী, সচ্চরিত্রা, প্রিয়-বাদিনী, সদাচার-সম্পন্না ও প্রিয়দর্শনা হন, এবং যিনি স্বামী-মুখ-দর্শন করিয়া পুত্র-মুখ-দর্শন-জনিত বিমল আনন্দ অনুভব করেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মচারিণী ও সাধ্বী। যিনি স্বামীর ধর্ম্ম, স্বামীর ব্রত-পালন, স্বামীকে দেবতুল্য-জ্ঞান, ও দেবতুল্য পরিচর্য্যা করেন, যিনি একান্ত-চিত্তে স্বামীর বশীভূতা থাকিয়া স্বামীর ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যাঁহার মন স্বামী-চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা করে না; স্বামী না বুঝিয়া কটু কথা বলিলেও অথবা ক্রোধ-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেও যিনি প্রসন্নবদনে অবস্থান করেন, যিনি অন্য পুরুষের মুখের দিকে তাকান না কিম্বা অন্য পুরুষের কথা চিন্তাও করেন না; স্বামী দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, কাতর বা পথশ্রান্ত হইলে যিনি অকাতরে সমাদর ও শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, যিনি কার্য্যদক্ষা, যত্নশীলা, অনলস, পতিপরায়ণা ও পুত্রবতী; যাঁহার মন সর্ব্বদা স্বামীর প্রতি প্রসন্ন থাকে; যিনি নিয়ত অন্নদান দ্বারা কুটুম্বগণের ভরণ-পোষণ করেন তিনিই সাধ্বী। যিনি, ঐশ্বর্য্য-সুখ-ভোগ-বিলাসে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া কেবল স্বামী সেবাই একমাত্র করণীয় জ্ঞান করেন;

যিনি প্রত্যুষে উঠিয়া গৃহসন্মার্জ্জন, গোময়-লেপন, স্বামীর সহিত একত্রে হোমানুষ্ঠান, বলিপ্রদান, ও দেবতা, অতিথি, ভৃত্যগণকে আহার-প্রদান করিয়া থাকেন, সকলের আহারের পরে যিনি নিজে ভোজন করেন, যাঁহাদ্বারা সকলে সন্তুষ্ট ও পরিপুষ্ট হয়, যিনি শ্বশুর শাশুড়ী, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট রাখেন, তাঁহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হয়। যিনি ব্রাহ্মণ, দরিদ্র অনাথ, অন্ধ, প্রভৃতি কৃপা-পাত্রদিগকে অন্নদান করেন, এবং স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্তা, ও তাঁহার সন্তোষ-সাধনরতা, তাঁহারই পাতিব্রত্য ধর্ম্মের ফললাভ হইয়া থাকে। পতি-ভক্তিই স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম, তপস্যা ও সনাতন স্বর্গ-স্বরূপ। পতিই স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, পরম বন্ধু ও পরমাগতি। অবলাগণের পক্ষে, পতির প্রসন্নতা-লাভ, স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হে নাথ! আপনি অপ্রীত থাকিলে আমার কখনই স্বর্গলাভের কামনা হয় না। পতি, দরিদ্র, ব্যথিত, বিপন্ন, রিপুবশবর্ত্তী বা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া যদি স্ত্রীর প্রাণ-বিয়োগকর কার্য্য কি অন্য কোন অকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে বলেন তাহাও স্ত্রীর কর্ত্তব্য। হে দেবাদিদেব! আমি আপনার নিকট স্ত্রীধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। যে নারী এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন তিনিই যথার্থ পতিব্রতা নামের যোগ্যা হইবেন।" ইহাই মহাদেবপ্রতি ভগবতীর বাক্য।

* * * *

পতিব্রতা কবিতা। (কবি মান কুমারী লিখিত)।

ভারত বালার কিবা আছে আর, প্রাণের সহায় কেবলি পতি
হৃদয়ের বল, দাঁড়াবার স্থল, জীবনের পথে একই গতি॥

দেখিনি রমণী রবির কিরণ, দেখেনি চাঁদিমা তারকা-রাশি।
হৃদয়ের আলো পতি-অনুরাগ, অমৃত তাহারি আদর হাসি ॥
সেই দেবতার মূরতি মোহন, পরতে পরতে হৃদয়ে আঁকা।
তাহারি প্রণয় জীবনী-শকতি, রমণী জীবন তাতেই রাখা ॥

*　　*　　*　　*

"হিন্দু-রমণী"—গীত।

("ধনে-ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা"—সেই সুর।)

শঙ্খ-সিন্দুর-আল্‌তাপরা, পর্ণ-কুটীর আলোকরা, হিন্দু ঘরের কুলবধূ
সকল ঘরের সেরা ; সে যে ধর্ম্ম দিয়ে তৈরি সে যে
লজ্জা দিয়ে ঘেরা।
এমন রত্ন কোথা তুমি পাবে না' ক খুঁজি, মাথার মণি করে রাখো
হিন্দু রমণী ॥ সে যে হিন্দু-রমণী ॥ ১ ॥

ভোগ-বিলাসে নাইক আশা, অগাধ ভক্তি-ভালবাসা,
সর্ব্বত্যাগী মহাযোগী, আছে কোন্ দেশে ?
সে যে জ্যান্ত পুড়ে মর্ত্তে পারে, মৃত-স্বামীর পাশে।
এমন রত্ন কোথা খুঁজে পাবে না' ক তুমি,
মাথার মণি ক'রে রাখো হিন্দু-রমণী ;
সে যে হিন্দু-রমণী ॥ ২ ॥

(শুনে) পতির নিন্দা পিতার মুখে, দাক্ষায়ণী মরেন দুঃখে,
সতীর কাছে যম হেরেছে এমন পতিব্রতা,
কোথা পাবে সেই সাবিত্রী এমন স্নেহলতা ?
এমন রত্ন কোথা খুঁজে পাবে না'ক তুমি,
মাথার মণি করে রাখো হিন্দু রমণী,
সে যে হিন্দু-রমণী ॥ ৩ ॥

দুঃখের বোঝা মাথায় ধরে, মুখটী বুঁজে চুপটী ক'রে,
সারা বছর কাটিয়ে দিলে আঁচল গায়ে দিয়ে,
(এমন) হাসিমুখে আধপেটা খায় কোন দেশেরি মেয়ে ?
এমন রতন কোথা খুঁজে পাবেনাক তুমি,
মাথার মণি করে রেখো হিন্দু-রমণী।
সে যে হিন্দু-রমণী ॥ ৪ ॥ (অজ্ঞাত নামা কবি।)

* * * *

"আমার গৃহ-লক্ষ্মী" কবিতা।

(হিন্দু পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত)

এত রূপ তবু রূপসী বলিয়া অন্তরে তব গর্ব্ব নাই।
ফুল-ভার-নতা বল্লরী সম; গুণ-ভার-নতা সর্ব্বদাই ॥
গৃহ-রাজ্যের মহারাণী তবু, চাকরাণী সম অনুক্ষণ।
নিজ সুখ-ভোগ ত্যজিয়া কেবল পরের সেবায় সমর্পণ ॥
শান্তি আনিয়া, স্বস্তি আনিয়া, করিয়া সকল দুঃখ দূর ;
আছ এ গৃহের কল্যাণরতা কল্যাণময়ী লক্ষ্মী মোর ॥ ১ ॥

* * * *

দগ্ধ সকল বিলাস-বাসনা, বসনে ভূষণে দৃষ্টি নাই।
সোজাসুজি শাঁখা, সিন্দুরে, তুমি আছ কি অপার তৃপ্তিতেই ॥
মণি-মাল্যের ধার ধারনাক, চুড়ি বালা ভাবো মস্ত ভার।
তুমি জানো "সতী নারীর জগতে পতিই শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার" ॥
পতির মতন কি আছে রতন, হীরা-চুনী-মতি তুচ্ছ সব ;
দৈন্যেরে মোর ধন্য করেছ, তোমার এ মধুর মহোৎসব ॥ ২ ॥

* * * *

ষড়ৈশ্বর্য্য-মণ্ডিতা দেবী, নারী-রূপে আছ সংস্থিতা।
হিন্দুর-গৃহ-মন্দিরে, সদা, বেদাদি শাস্ত্রে কীর্ত্তিতা ॥
বিপদে বন্ধু, সেবায় শিষ্যা উপদেশ-দানে মন্ত্রীবর।
রঙ্গিনী তুমি জীবনে মরণে, সঙ্গিনী তুমি নিরন্তর।
স্নেহেতে জননী, ভক্তিতে বোন্, জীবন-রণের চিরন্তন ;
বিজয়ী-সৈন্য কর্ম্ম-কেন্দ্রে, চিত্তের দৃঢ় আকর্ষণ ॥ ৩ ॥

* * * *

স্বামী-সাধনায় দক্ষ-দুহিতা, মানবী-মূর্ত্তি সতীত্বের।
ভক্তিতে সীতা, পরম যোগ্যা, প্রতিনিধি তুমি সংসারের ॥
সন্তানগণ-পালনে যশোদা, প্রেমে-বৃক-ভানু-নন্দিনী ॥
সম্ভাষণে সুকণ্ঠ-মেনকা, প্রেম-সুধা-নিঃস্যন্দিনী ॥
রূপেশ্রী লক্ষ্মী, মোক্ষ-দায়িকা বাক্‌বাণী গুণে-গৌরবে।
অন্নদানেতে অন্নপূর্ণা পারিজাত তুমি সৌরভে ॥ ৪ ॥

* * * *

ভোগ-লালসার মধ্যে তোমার একি অসাধ্য সংসাধন।
সংযত-চিত সংহত যত ইন্দ্রিয়গণ দুর্দ্দমন ॥
তোমার কর্ম্মে, তোমার ধর্ম্মে, তোমার কঠোর তপস্যায়,
তৃপ্ত সকল পিতৃ-পুরুষ, অঞ্জলি-তারা নিত্য পায় ॥
অঞ্চল-ছায়া-আশ্রয়ে গৃহে, চঞ্চলা হয় অচঞ্চল।
এনেছে স্বর্গ চতুর্ব্বর্গ, ভূতলে তোমারি পুণ্য-ফল ॥ ৫ ॥

* * * *

পল্লী-বধূ কবিতা। (কবি কালিদাস রায় রচিত)।

না ধরিতে প্রাচী লোহিত বরণ, না ডাকিতে সব পাখী।
গ্রাম-পথে-ঘাটে না পড়িতে সাড়া, না মেলিতে ফুল আঁখি ॥

কে গো ঐ জাগি, শয্যা তেয়াগি, দ্বারে দ্বারে ঢালে জল।
গোময় মাড়ুলি লেপনে জাগায়, পুণ্য তুলসী-তল ॥
উঠান ছাড়িয়া না উঠিতে রোদ্, ঘরের পৈঠা পরে।
কলস ভরিয়া জল লয়ে কেবা, স্নান করি ফিরে ঘরে ॥
না বাড়িতে বেলা, দেব-দেউলের দূর করি মলিনতা।
করে আহ্নিক, রন্ধন তরে গুরুজনে সহায়তা ॥
লজ্জা-সরম, সজ্জা-পরম, অন্তর ভরা মধু।
অবিরত-সেবা-সাধন-নিরতা এযে গো পল্লীবধূ ॥ ১ ॥

*   *   *   *

গুরুজনদের ভোজনের শেষে, অতিথি ভিখারি তুষি।
ছেলেপুলেগুলি, নাওয়ায়ে, ধোয়ায়ে, খাওয়ায়ে, করিয়ে খুসী ॥
পাতের অন্নে উদর পূরিয়া, এঁটো কাঁটা খুঁটে তুলি।
আসি ঝটপট্ খিড়কীর ঘাটে, কে ধোয় বাসনগুলি ?
সুঁচ-সূতা লয়ে, সারি শত কাজ, কত কাজ, ঝাঁট্ পাটে। *
পাড়ার মেয়ের খোঁপা বেঁধে দিয়ে, চলে কে দিঘীর ঘাটে ?
গৃহ-পারাবতে আহারে তুষিয়া, তরুমূলে জল দিয়া।
সাঁজ-দীপগুলি করি পরিপাটী, রাখে কেগো সাজাইয়া ?
লজ্জা-সরম, লজ্জা-পরম, অন্তর ভরা মধু।
অবিরত-সেবা-সাধন-নিরতা, এ যে গো পল্লীবধূ ॥ ২ ॥

*   *   *   *

সাঁজের বাতিটী জ্বালিয়া, তাহারে বাঁচায়ে আঁচল আড়ে।
তুলসী-তলে, দেবের দেউলে, ঘুরে কে গো দ্বারে দ্বারে ?
খোকা-খুকীদের উপকথা বলি খেয়ে মুখে শত চুম।
অশেষ প্রশ্নে উত্তর দিয়ে পাড়ায় তাদের ঘুম ॥

শ্বশুর-শাশুড়ী পদ-সেবা করি লভিয়া আশীষ শিরে।
সবার ভোজন-শয়নের শেষে চলে কে শয়নে ধীরে ?
শয়নের ঘরে, শ্রান্ত পতির সেবা-রতা পদ-মূলে।
চরণের পরে রাত্রি তুপরে কে গো ঘুমে পড়ে ঢুলে ?
লজ্জা-সরম, সজ্জা-পরম, অন্তর ভরা মধু।
অবিরত-সেবা-সাধন-নিরতা এযে গো পল্লীবধূ॥ ৩ ॥

* * * *

উচ্চ হাসিটী শোনে নাই কেহ, নাহি রাগ অভিমান।
আঁখি-পুট-তলে, নয়নের জলে, কোথা ব্যথা অবসান॥
গৃহ-কোণে কোথা গৃহ-কাজ-রতা, কেহ ত পায় না সাড়া।
গোপনে লক্ষ্মী নেমেছে এ বাড়ী জানে তা সকল পাড়া॥
ননদীর গালি ছাড়া কোন কথা, কাণ হতে নাহি ফিরে।
বহিতেছে অবগুণ্ঠন-তলে, মৌন-মহিমা ধীরে॥
গৃহ-কাজে কর হয়েছে কঠোর, শাঁখাটী হয়েছে সাদা।
কাহার কঠিন লৌহ-বলয়ে লক্ষ্মী পড়িল বাঁধা ? ॥
লজ্জা-সরম, সজ্জা-পরম, অন্তর ভরা মধু।
অবিবত-সেবা-সাধন-নিরতা এযে গো পল্লী বধূ॥ ৪ ॥

* * * *

মহাভারতের আদি পর্ব্বে শকুন্তলা উপাখ্যানে "নারীর গৌরব" বর্ণনা করিয়া শকুন্তলাদেবী মহারাজা তুষ্মন্তকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—"পতি স্বয়ং ভার্য্যার গর্ভে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন ; ঐ পুত্র পিতামহদিগকে উদ্ধার করে এবং পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করে। গৃহ-কর্ম্ম-দক্ষা, পুত্রবতী, পতি-পরায়ণা, ভার্য্যাই যথার্থ ভার্য্যা। ভার্য্যা, ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপ, পরম বন্ধু এবং ত্রিবর্গ লাভের মূল কারণ। ভার্য্যা-

বান্ লোকেরাই সুখী ও সৌভাগ্য-সম্পন্ন। প্রিয়ম্বদা ভার্য্যা, অসহায়ের সহায়, ধর্ম্ম-কার্য্যে গুরু, আর্ত্ত ব্যক্তির জননী-স্বরূপা ও ক্লান্ত পথিকের বিশ্রাম-স্থান-স্বরূপ। ভার্য্যাবান্ ব্যক্তি সকলেরই বিশ্বাস-ভাজন। মরণান্তর কিছুই অনুগামী হয় না, কেবল পতিব্রতা-নারী স্বামীর জন্য তথায় অপেক্ষা করে। পতি, ভার্য্যাকে ইহ-পরলোকের সহায়-স্বরূপ প্রাপ্ত হন বলিয়া লোকে পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে। পতি, ভার্য্যার গর্ভে পুত্ররূপে জন্মেন বলিয়া তিনি মাতৃ-স্বরূপা। শারীরিক ও মানসিক পীড়ায় কাতর হইয়া প্রিয়তমা ভার্য্যাকে দেখিলে, আতপতাপিত পথিকের সুশীতল জল-প্রাপ্তির ন্যায় সর্ব্ব দুঃখ-কষ্ট দুর হইয়া পরিতোষ লাভ করে। যে পুত্র ভিন্ন বংশ রক্ষা হয় না, যে পুত্র ব্যতিরেকে পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ড-লোপ হয় সেই পুত্রলাভ ভার্য্যা দ্বারাই হইয়া থাকে অতএব ভার্য্যার গুরুত্ব কত বেশী তাহা সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন।” পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে পতি কর্ত্তৃক পত্নী কিরূপ শ্রদ্ধা, সম্মান ও আদরের সহিত আচরিতা হইতেন তাহা এই শকুন্তলা কৃত বক্তৃতা হইতে বুঝিতে পারা যায়। ব্যবস্থা-শাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষি মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন স্ত্রীকে সন্তুষ্ট না করা মহাপাপ মধ্যে গণ্য।

নারীর গৌরব গাথা।

তুমি গো মা জগদ্ধাত্রী! নারী-রূপে ধরাতলে।
সৃষ্টি-স্থিতি-পালন-কর্ত্রী তাই তোমারে লোকে বলে॥
মানবে সৃজন তরে, ধরি মা নিজ উদরে,
নারী-রূপে জগদম্বে! জগজ্জনে প্রসবিলে॥
সন্তানে পালন তরে, কষ্ট সহ অকাতরে,
সঞ্জীবনী-সুধা দাও মা, শিশু-মুখে স্তন্য-ছলে॥

নিজ-সুখে ভুলে যাও, মানবে আহার দাও,
তুমি গো মা অন্নপূর্ণা, নারীরূপে পাকশালে ?
মুমূর্ষু আতুর জনে, কে বাঁচায় তুমি বিনে,
সেবা করি নিশি দিনে দাসী-রূপে কুতূহলে ॥
তুমি মা আদর্শ-সতী, পতি যে নারীর গতি,
(তাই) নারীরূপে দাক্ষায়ণি পশো পতি-চিতানলে ॥
তুমি গো মা মহামায়া, সর্ব্ব-জীবে তব দয়া,
(তাই) দয়াময়ী নারীকায়া ধরেছ সর্ব্ব-মঙ্গলে ॥
পরহিত-রতা নারী, সে যে তুমি শুভঙ্করী,
কিযে ব্রত আহা মরি, নিষ্কাম যাহারে বলে ॥
পর-দুঃখ বিমোচনে, তুচ্ছ কর নিজ প্রাণে,
রমণী পারে কেমনে, মানবী দেবী না হলে ?
দুঃখ কষ্টে সহিষ্ণুতা, অটল অচল যথা,
তুমি যে অচল-সুতা, নারীরূপে মহীতলে ॥
রাজপুত-নারী-বেশে রক্ষা কর নিজ দেশে,
নৃমুণ্ড-মালিনী-শ্যামা, পশিঘোর রণস্থলে ॥
তোমারে দেখিতে চাই, খুঁজিয়া ত নাহি পাই,
জ্ঞান নাই ভাবি তাই তুমি থাকো নভোস্তলে ॥
তুমি গো মা ভগবতি ! তুমি যে মা নারী জাতি,
তোমা বিনা বসুমতী চলে যেত রসাতলে ॥
ধন্য ধন্য সেই নরে, ভগবতী যার ঘরে
গুণবতী নারীরূপে স্বর্গ তার করতলে ॥

* * * *

যা দেবী সর্ব্ব-ভূতেষু শক্তি-রূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
সর্ব্ব মঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে।
শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণী নমোস্তুতে॥

নবযুগের নারী-শিক্ষা।

বর্ত্তমানকালের শতবর্ষ পূর্ব্বে বাংলাদেশে নারী-শিক্ষা একেবারেই প্রচলিত ছিল না, বলিলে সত্যের বিশেষ অপলাপ করা হয় না। তখন এইরূপ সংস্কার ছিল যে, স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়, অথবা কুলটা হইয়া যায়। তখন কদাচিৎ ভদ্রঘরের দুই একটী বুদ্ধিমতী মেয়ে পিতা, পিতৃব্য, অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট কথঞ্চিৎ শিক্ষা পাইয়া, বটতলার ছাপা কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ অথবা সেইরূপ কোন বই পড়িতে পারিতেন এবং কোন প্রকারে একটু পত্র লিখিতেও পারিতেন। কিন্তু তাদৃশী "বিদ্যাবতী" নারীর সংখ্যা এত কম ছিল যে, তখনকার কালে অক্ষর-পরিচয়-প্রাপ্ত স্ত্রীলোক ছিলনা বলায় নিতান্ত দোষ হইতে পারে না। তৎপরে অর্থাৎ বর্ত্তমানকালের ৫০।৬০ বছর পূর্ব্বে (আমার বাল্যকালে) ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট দ্বারা স্থানে স্থানে বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে, বালকগণের শিক্ষার কথঞ্চিৎ সুবিধা হইতে লাগিল। সেই সময়ে, কদাচিৎ দুই এক গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, স্থানীয় বালিকাগণ লেখাপড়া শিখিতে উৎসাহ পাইতে লাগিল। তখনকার গ্রাম্য-বালিকা দুই চারিখানি বাংলা পুস্তক পাঠ, ও পত্র লিখিতে পারিলেই যথেষ্ট "শিক্ষিতা" হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইত। অবশ্য সহরের কথা অন্যরূপ ছিল।

তখন ভদ্রঘরের মেয়েরা ৮।৯ বছর বয়স মধ্যেই বিবাহিতা হওয়া হেতু আর স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাইত না। সুতরাং ৩।৪ বছর সময় মধ্যে উহা অপেক্ষা বেশী শিক্ষা পাওয়া আশা করা যায় না। মেয়েরা বিবাহিতা হওয়ার একবছর পর হইতে শ্বশুর বাড়ী যাইতে আরম্ভ করিত। তখন, সেখানে এবং বাপের বাড়ীতে, সেই অল্পবিদ্যা সাহায্যে নাটক, নভেল, উপন্যাস পাঠ ও পত্র লেখালেখিতেই নিজের অবসর সময় কাটাইত,—তাহাতে কাহারো কাহারো পক্ষে মানসিক-বৃত্তির ঘোর অধঃপতন ঘটিত। কিন্তু এখন আর সে কাল নাই। এখনকার মেয়েরা অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহিতা হইয়া থাকে সুতরাং বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে অধিক পরিমাণে সময় ও সুযোগ প্রাপ্ত হয়। অপিচ, যুগপরিবর্ত্তন হেতু আজকাল সামাজিক রীতি, নীতি, পদ্ধতি, সমস্তই আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। তখনকার স্ত্রীগণের আচরণ, ব্যবহার, অতিরিক্ত লজ্জা, ভীরুতা এবং নানাবিধ কুসংস্কার, অনাবশ্যক বিষয়ে অযথা শুচিতা অথচ অতি আবশ্যক বিষয়ে নিতান্ত অশুচিতা, নানাপ্রকার অজ্ঞানতা, মনের সংকীর্ণতা ইত্যাদি সমস্তই ক্রমশঃ লোপ পাইয়া নবভাবে সংগঠিত হইতেছে।

ইহাই স্বাভাবিক। এখন, স্থিতিশীল হইয়া এই পরিবর্ত্তনের গতিরোধ করিতে গেলে কিম্বা ইহার বিরুদ্ধগামী হইতে গেলে, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক, অসম্ভব এবং দেশের ও সমাজের উন্নতি

ও মঙ্গলের বিরোধী হইবে। বর্ত্তমান কালের জগৎ-ব্যাপী এই উন্নতির সমকক্ষতা রক্ষাকল্পে আমরা যদি যথোপযুক্ত ভাবে চেষ্টা না করি, তবে দূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব লোপের বিশেষ আশঙ্কার হেতু আছে। এই কারণে জাতীয়-নেতারা বর্ত্তমানে নারী-শিক্ষা ও স্বদেশ-ভক্তির প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। আমিও তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে আমার আত্মীয়াগণকে পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করিয়া, সেইরূপ ভাবে নারী-শিক্ষার নূতন ও যুগোপযোগী শিক্ষা-প্রণালীর কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে ধারা-বাহিক রূপে প্রদান করিবার চেষ্টা করিলাম। আমি আশা করি, আমার আত্মীয়া ও অন্য বালিকাগণ এই সমস্ত এবং অন্যান্য আরো বেশী, সময়োপযোগী উপদেশ গ্রহণ ও তদনুসারে শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়া নিজের ও বাঙ্গালী সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির সূচনা করিবে। তখনকার অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ের স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়গুলি বহু বিস্তৃত—এমন কি, বর্ত্তমান বালকগণের শিক্ষণীয় বিষয় অপেক্ষাও বেশী। রন্ধন-বিদ্যা, ধাত্রী-বিদ্যা, শিশু সন্তান-পালন ও শিক্ষাদান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ, বালিকাদিগের ভাবী সুখ-স্বচ্ছন্দতা-পক্ষে অপরিহার্য্য—যাহা বালকদিগের জানার মোটেই দরকার নাই। নারী-শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল বিষয়ের গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করিয়াছি তাহাই নিম্নে বিবৃত করিলাম।

(১) লেখা-পড়া শেখা :—পত্র লিখিতে ও সংসারের হিসাব-পত্র রাখিতে শিক্ষা করা। রামায়ণ, মহাভারত পাঠ ও অর্থবোধ হওয়ার মত জ্ঞান লাভ করা এবং বর্ত্তমান যুগের স্ত্রী-পাঠ্য ও অন্য নীতিবিষয়ক বাংলা পুস্তক পাঠ ও বুঝিতে সক্ষম হওয়া। দুই একখান ইংরাজী পুস্তক পাঠ ও ইংরাজী হাতের লেখা শিক্ষা করা,

যাহাতে পত্রের শিরোনাম পড়িতে ও লিখিতে পারা যায়। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইতে পারে। গত আদম-শুমারি লোকগণনায় হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে বাংলাদেশে প্রতি এক হাজার নারীর মধ্যে মাত্র ১১জন লেখাপড়া জানে। সেই হিসাবে বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রদেশে ২৪ জন ও ব্রহ্ম দেশে ১১২ জন লিখিতে পড়িতে জানে। সুসভ্যা বঙ্গনারীগণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা শোচনীয় তথা লজ্জাজনক অধঃপতন অধিক আর কি হইতে পারে ?

(২) শরীর-পালন ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ। দেশব্যাপী মহামারি ও সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে, কি ভাবে সাবধান হইতে হইবে, কি ভাবে নিজের গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিলে, ভাবী রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ, ও কার্য্যক্ষেত্রে সেই জ্ঞান-অনুসারে চলিতে পারা, এবং ডাক্তারের নিকট প্রাপ্ত সেই সময়োপযোগী উপদেশ, কার্য্যে পরিণত করার ক্ষমতা-লাভ। দূষিত পানীয় জল, দূষিত খাদ্য, সংক্রামক বিষ-দুষ্ট খাদ্য-পানীয়, দূষিত বায়ু-সেবন, স্যাঁত সেঁতে ও অস্বাস্থ্যকর ঘরে বাস, এ সমস্তের অপকারিতা বুঝিতে পারা এবং প্রতি-বিধান করা,—তৎসম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ। পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য কয়েক ঘর গৃহস্থ মিলিত হইয়া অথবা একাকী ব্যয় করিয়া নলকূপ খনন করা বিধেয়। অথবা অল্প জলের জন্য, বালি-কয়লা দ্বারা জল পরিষ্কার করিয়া লওয়া। তাপমান-যন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করা ও রোগীর দৈনিক তাপ ও পীড়ায় হ্রাসবৃদ্ধি সমস্ত বিবরণ যথা-উপযুক্ত-ভাবে লিখিয়া রাখিয়া চিকিৎসকের জ্ঞাপন করার প্রণালী শিক্ষা করা ; চিকিৎসকের উপদেশ মনে

রাখিয়া সেই ভাবে রোগীর শুশ্রূষা করা। মাছি দ্বারা আনীত সংক্রামক বিষের পরিচালনা হইতে আত্মরক্ষা, ও মশা হইতে সন্তানগণকে রক্ষা করা। পথ্য-পাক করিতে ও সেকতাপ দিতে শিক্ষা করা। উচ্চস্থান হইতে পতন, অগ্নিদাহ, অস্থি-ভগ্ন, জলে-ডোবা বা অন্য কারণে শ্বাস-রোধ, রক্তস্রাব, মূর্চ্ছা, ইত্যাদি প্রকার আকস্মিক দুর্ঘটনায় ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বে যথাসাধ্য, যথা-সম্ভব, সময়োপযোগী সাহায্য প্রদান করিতে জ্ঞান থাকা। (আকস্মিক দুর্ঘটনা জন্য পরবর্ত্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

(৩) ব্যায়াম-শিক্ষা ঃ—শরীরের উন্নতি-কল্পে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই পক্ষে ব্যায়ামের বিশেষ আবশ্যকতা আছে; সুতরাং নারীগণ নিজেরা ব্যায়াম করিবে ও সন্তানগণকে ব্যায়ামে উৎসাহিত করিবে। যে সকল স্ত্রীলোকের দূর হইতে কলসী করিয়া জল আনিতে হয়, কিম্বা কূয়া হইতে সর্ব্বদা জল তুলিতে হয়, কিম্বা ঢেঁকিতে ধান ভানা, যাঁতা ঘুরাণো, বাটনা বাটা অথবা সোডা-সাবান কি ক্ষারে-সিদ্ধ কাপড় কাচিতে হয় তাহাদের পক্ষে পৃথক ব্যায়ামের তত আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যাঁহারা দাসদাসী দ্বারা ঐ সব শ্রমসাধ্য কাজ করান এবং নিজেরা নাটক-নভেল পড়িয়া অথবা ঘুমাইয়া সময় কাটান, তাঁহাদের পক্ষে ব্যায়াম অতি দরকারি। নতুবা নানা প্রকার পীড়ার উৎপত্তি হইবে বিশেষতঃ প্রসব-কালে ডাক্তারের সাহায্য-ব্যতীত কদাচ সুপ্রসব হইবে না। অলস প্রসূতীর সুপ্রসব এবং সুসন্তান প্রসব প্রায় অসম্ভব বলিয়া অনেক ডাক্তারের নিকট শুনিয়াছি। কলিকাতার ধনী লোকের ঘরের আলস্য-পরায়ণা, কন্যা-বধূরা একবারও বিনা ডাক্তার, বিনা অস্ত্র প্রয়োগে প্রসব হইতে পারেন না। কিন্তু পল্লীগ্রামে নিয়ত

গৃহ-কার্য্যেরতা, শারীরিক-পরিশ্রমশীলা গরীবের ঝি বৌ, কখন্ কোন্ সময় যে অনায়াসে ধাত্রীর বিনা-সাহায্যে প্রসব হইয়াছে তাহা কেহই জানিতে পারে না—যাহা কেবল প্রসূত শিশুর উচ্চ ক্রন্দনের রোলই লোককে জানাইয়া দেয়। আজকাল কলিকাতা সহরে অনেক স্থানে নারীর জন্য ব্যায়ামাগার স্থাপিত হইয়াছে। দৌড়ানো, দ্রুত-ভ্রমণ, পথ-পর্য্যটন, সন্তরণ, লাঠিখেলা, মুগুর-ভাঁজা, ডাম্বেল-অনুশীলন, ও অন্যান্য কসরৎ করা নারীর পক্ষে উপযোগী, যদ্দ্বারা তাহাদের নিজের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া সাহসী ও আত্মরক্ষায় সক্ষমা হইবে এবং সুস্থ সবল ও দীর্ঘজীবী সন্তান প্রসব করিয়া দেশের ও সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে। বালিকাগণ অল্প বয়স হইতেই ব্যায়ামে অভ্যস্ত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

(৪) রন্ধন-বিদ্যা :—খাদ্য-দ্রব্য সুচারুরূপে পাক করিতে শিক্ষা করা। রন্ধন-বিদ্যা সম্বন্ধে নূতন করিয়া বেশী কিছু বলার আবশ্যকতা নাই ; তবে এইটুকু জানার দরকার যে, মনুষ্য-শরীরের উন্নতি-জন্য কিরূপ খাদ্য উপযোগী, আর কিরূপ খাদ্যই বা অনুপযোগী তাহার মোটামুটী জ্ঞান-লাভ ও রন্ধন প্রণালী শিক্ষা করা আবশ্যক। অধিক মশ্‌লা দেওয়া কিম্বা ঘৃতাক্ত পোলাও কালিয়া আহারে মাত্র লোভ বৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া হয় কিন্তু ঐ সমস্ত দ্বারা শরীরের কিছুমাত্র উপকার হয় না। গুরুপাক-দ্রব্য এবং বিষাক্ত-বিমিশ্র-ঘৃতে-প্রস্তুত বাজারের যে কোন প্রকার মিষ্টান্ন প্রভৃতি একেবারেই ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। পিতলের কিম্বা তামার হাঁড়িতে অধিক সময় পূর্ব্বে পাক করা তৈলাক্ত কি ঘৃতাক্ত দ্রব্য, রাসায়নিক সংযোগ বিষবৎ হয়। উহা খাইলে ভেদ-বমি এমন কি

কলেরা পর্য্যন্ত হইয়া প্রাণনাশ ঘটিতে পারে। রোগীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পথ্য-পাক শিখিতে হয়। বাসি মাছ-মাংস-ডিম এমন কি বাসি জিনিস মাত্রেই শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর। খাদ্য-দ্রব্যে যাহাতে মাছি না বসে তৎপক্ষে সাবধান হইতে হইবে।

এস্থলে এই প্রসঙ্গে, বঙ্গ-গৃহিণীদিগকে লক্ষ্য করিয়া অতি দুঃখের সহিত একটী কথা বলিতে হইতেছে। কলিকাতা সহরে এবং পল্লীগ্রামে স্থানে স্থানে আজকাল, ধনী ও মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহিণীরা অনেকেই রন্ধন করিতে আর পাকশালে যাইতে চান না। যে কার্য্যে পরিবারবর্গের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে—যে কার্য্যে তাহাদের স্বাস্থ্য-সম্পদ ও দীর্ঘ-জীবন লাভের, একমাত্র নিদান, সেই কার্য্য, গৃহিণীরা আজকাল, হেয়, কষ্টকর, অঙ্গ-মলিনকর ও অপমানজনক বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন! তাঁহারা সেই অতিগুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে, সাধারণতঃ বেহার ও উড়িষ্যা-দেশীয়, অপরিষ্কার, অশুচি, ব্রাহ্মণ-নামধারী, অজ্ঞাত-কুলশীল, অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন—যাহার একমাত্র মায়া-মমতা নিজের প্রাপ্য বেতনের উপর, পরন্তু প্রভুর সন্তানদের উপরে নহে—(যে সন্তানদের পীড়াশান্তি জন্য রাশি রাশি অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে) সুতরাং যাহা কিছু খাদ্য, অখাদ্য, স্বাস্থ্যহানিকর অথবা পীড়া-জনক হউক না কেন, অবাধে পরিবেশন করিয়া নিজের দৈনিক "কর্ত্তব্য" সম্পাদন করিয়া থাকে।

আমাদের বঙ্গীয় সমাজে, সেকালে অর্থাৎ ৫০।৬০ বছর পূর্ব্বে (আমার বাল্যকালে) দেখিয়াছি, পল্লীগ্রামের ধনী জমিদার-গৃহিণীরা পর্য্যন্ত স্বহস্তে নিত্য নিয়মিত রন্ধন-ক্রিয়া সমাপন করিতেন। পাড়ার মধ্যে কোন বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজনের

রন্ধন তাঁহারাই করিতেন এবং উহাতে গৌরব-বোধ করিতেন। ঘটনা-ক্রমে কোন নামজাদা পরিপক্ক পাচিকা-গৃহিণী কোন যজ্ঞে পাক করিতে আহূত না হইলে অপমানিত জ্ঞান করিতেন। আমাদের দেবী ভগবতী জগদম্বা অন্নপূর্ণারূপে রন্ধন করিয়া নিজ স্বামী দেবাদিদেব মহাদেবকে অন্ন-পরিবেশন করিতেছেন এই ভাবেই তিনি প্রতি বৎসর বঙ্গদেশে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। পাণ্ডব-গৃহিণী দ্রৌপদী দেবীর রন্ধনের প্রশংসা চিরকাল হইতেছে ও হইতে থাকিবে। এখন পর্য্যন্তও বালিকারা "দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী" হইবার গৌরব-লাভের নিমিত্ত শ্রীহরির নিকট বর-প্রার্থনা করিয়া থাকে। ইঁহারা কেহই রন্ধন-কার্য্য কষ্টকর কিম্বা সম্মানের হানিজনক মনে করেন নাই।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় দিল্লীর পাঠান-সম্রাট নাসির-উদ্দীন সাহ, অতি নিরীহ, ধর্ম্ম-ভীরু, প্রজাপালক ও মিতব্যয়ী নরপতি ছিলেন। তিনি "কোরাণ" নামক মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থ নকল করিয়া, বিক্রয়-লব্ধ অর্থে নিজের ও সম্রাজ্ঞীর ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। একদা রাজ-মহিষী স্বহস্তে রন্ধনকালে, দৈবযোগে হাত পুড়িয়া যাওয়ায়, বিলাপ করিতে করিতে সম্রাটের নিকট একটী পাচিকা নিযুক্ত করিবার প্রার্থনা জানাইলে, সম্রাট বলিলেন, যে, তাঁহার লিখিত কোরাণ-বিক্রয়-লব্ধ অর্থ এত সামান্য যে, তদ্দারা রাজ-দম্পতির গ্রাস-আচ্ছাদন সঙ্কুলান হইয়া অবশিষ্ট কিছুই উদ্বৃত্ত হয় না, সুতরাং পাচিকা নিযুক্ত করা তাঁহার সাধ্যাতীত। আর প্রজাবর্গ-প্রদত্ত যে সমস্ত ধনরত্ন রাজ-কোষে সঞ্চিত রহিয়াছে, উহা আবার তাহাদেরই মঙ্গলের জন্য ব্যয়িত হইবে, সুতরাং তাহা হইতে কিছু লইয়া নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা ও আরাম বা বিলাসের জন্য ব্যয় করা

ন্যায় ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য হইবে। এমত অবস্থায় পাচিকা নিযুক্ত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই কথা শুনিয়া সেই ভারত-সম্রাজ্ঞী কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া আবার পুর্ব্বের ন্যায় স্বহস্তে পাকক্রিয়া সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে আমি সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, ষড়ৈশ্বর্য্য-শালিনী, মহামহিমময়ী, ভারত পূজিতা, অন্নপূর্ণাদেবী, এবং প্রভূত-আভিজাত্য-গৌরব-সম্পন্না-দ্রুপদ-রাজনন্দিনী, যিনি মানব-মনের অনন্ত-বর্দ্ধমান-দুরাকাঙ্ক্ষা-পরিসমাপ্তির নিদর্শন-স্বরূপ, রাজসূয় মহাযজ্ঞে পবিত্রীকৃত, ইন্দ্রপ্রস্থের মহাগৌরবজনক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং পাঠান-শাসিত বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের একছত্র সম্রাট্, দিল্লীর বাদসাহ নাসিরুদ্দিন-মহিষী, এবং এইরূপ আরও শত সহস্র অজ্ঞাত-নাম্নী, সর্ব্বোচ্চ যশঃ-মান-অর্থ-বিত্ত-শালিনী কীর্ত্তিমতী ভারত-ললনা যে পাক-কার্য্যকে গ্লানিজনক, কষ্টসাধ্য ও সম্মান-হানি-কর মনে করিয়া বর্জ্জন করেন নাই, সেই কার্য্য বর্ত্তমানকালে, কোন্ ধনী, মানী, সুকোমলদেহা, শ্রম-বিমুখা, আরাম-প্রিয়া, বিলাসিনী, বঙ্গ-মহিলা, সুস্থ-দেহে, বর্জ্জনীয় জ্ঞান করিতে ইচ্ছা করেন? এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইল বলিয়া আমি একান্ত দুঃখিত হইতেছি।

(৫) গৃহ-শিল্প:—ইহা অনেক প্রকারের আছে, তন্মধ্যে বালিকাদের পক্ষে শিক্ষণীয় হইতেছে—নিজের সেমিজ সেলাই, শিশুদিগের ছোট ছোট জামা সেলাই, ছেঁড়া কাপড় রিপু করা, কাঁথা সেলাই, মোজা, গেঞ্জি, আসন, প্রস্তুত শিক্ষা করা, চরকায় সূতা কাটা, ও সেই সুতাদ্বারা ঝাড়ন, গামছা, তোয়ালে, বালিসের ওয়াড় প্রস্তুত—(যাহা তাঁতের সাহায্য ব্যতীত অন্য সহজ উপায়ে

হইয়া থাকে) পরিশেষে তাঁতে বস্ত্র-বুনন। ইহা ভিন্ন মাদুর, পাটী, মোড়া, পাপোষ, কুশাসন প্রভৃতি অনেক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ যাহা ঘরে বসিয়া স্ত্রীলোকে অনায়াসেই করিতে পারে। পূর্ব্ব-বঙ্গের ঢাকা প্রভৃতি স্থানের স্ত্রীলোকে সূচের দ্বারা কাপড়ে ও কাঁথায় যেরূপ ফুল কাটিয়া থাকে তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ঐ সমস্ত নিজেদের ঘরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ও কখনো কখনও বা বিক্রীত হইয়া থাকে।

(৬) ধাত্রী-বিদ্যা :—সন্তান প্রসবকালে এবং প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে প্রসূতীকে উপযুক্ত সাহায্য করিতে পারা ও নবজাত শিশু বাঁচাইয়া তোলা ইত্যাদি ধাত্রীর কাজ, উপযুক্ত পাকা ধাত্রীর সঙ্গে থাকিয়া হাতে ধরিয়া শিক্ষিত হওয়া, কিশোরী ও যুবতীদের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। এই সম্বন্ধে ডাক্তার ৺ যদুনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত "ধাত্রীশিক্ষা" নামক পুস্তক ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায় কৃত "প্রসূতী পরিচর্য্যা" নামক পুস্তক পাঠে, ধাত্রী-বিদ্যা-বিষয়ে, বিশেষ জ্ঞান-লাভ করা যাইবে। একারণ এস্থলে আর অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। তবে এইমাত্র সাধারণ ভাবে নারীদিগকে বলা বিশেষ দরকার যে, অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পূর্ব্ব হইতে প্রসবের দিন পর্য্যন্ত শ্রম-সাধ্য কাজকর্ম্ম করিয়া অথবা ব্যায়ামের দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথেষ্টরূপ সঞ্চালিত রাখিলে অক্লেশে সুপ্রসব ও সুস্থ, সবল, সুসন্তান প্রসব হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে প্রসবের ২।৩ মাস পূর্ব্ব হইতে পরিশ্রমের মাত্রা ক্রমশঃ কমাইতে হয় এবং সাবধান থাকিতে হয় যেন বিশেষ কঠিন এবং শ্রম-সাধ্য কাজ করিতে যাইয়া গর্ভস্থ সন্তানের অনিষ্ট না ঘটনা হয়। প্রসবের নিকটবর্ত্তী সময়ে গুরুভার-দ্রব্য-উত্তোলন

কিম্বা সিঁড়ি দিয়া দ্রুত অবতরণ কিম্বা লম্ফ-প্রদান প্রভৃতি কার্য্য একেবারেই করিতে নাই।

(৭) চিকিৎসাও রোগী-শুশ্রূষা :—সহজ ও প্রথম-শিক্ষার্থীর উপযোগী হোমিওপ্যাথী "গৃহ চিকিৎসা" ও ভৈষজ্যতত্ত্ব" নামক পুস্তক দুইখানি উত্তমরূপে পাঠ করিয়া তন্মধ্য-হইতে বিশেষ আবশ্যকীয় ও নিয়ত-ব্যবহার্য্য ১৫।২০টা ঔষধের গুণাবলী শিক্ষা করিয়া সেই ঔষধ কয়টী সঙ্গে রাখিবে ও নিজ সংসারে ও গরীব দুঃখীদিগকে বিতরণ করিতে পারিলে যথেষ্ট সৎকাজ করা হইল বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিবে। আজকাল যেরূপ সামান্য দামে হোমিওপ্যাথী ঔষধ বিক্রয় হইতেছে তাহাতে অর্থ-সম্বন্ধে ইহা বড় কঠিন কাজ নহে। তবে ঐ কার্য্যে রোগী-পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিবার যথেষ্ট সময় হাতে পাওয়া চাই। ইহা ভিন্ন কলেরার প্রথমে দিবার জন্য, পৃথক বাক্সে, পৃথক স্থানে, রুবিণী সাহেবের ক্যাম্ফর, যাহাকে বাংলায় "কর্পূরের আরক" বলে তাহা রাখিবে। এই ঔষধ প্রয়োগের লক্ষণ আদি পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিশদ-ভাবে বলা হইবে। এই ঔষধ কলেরার প্রারম্ভে দিলে অনেক স্থলে রোগী আরাম হইতে পারে।

রোগীর শুশ্রূষা সম্বন্ধে ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে তাপমান যন্ত্র দ্বারা রোগীর তাপ, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, অথবা ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর, অথবা এবেলা ওবেলা লইয়া একটা কাগজে লিখিয়া রাখিতে হয়। সেই সঙ্গে রোগীর প্রস্রাব বাহ্যে কি অন্য উপসর্গ সমুদয় সময়-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক লিখিয়া রাখিয়া ডাক্তারকে দেখাইতে হয়। রোগীর বিছানায় কি ঘরে, মল, মূত্র, থুথু, গয়ের না থাকে। রোগীর ঘর এবং বিছানা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয় এবং ঠিক

বিছানার নিকট ভিন্ন, অন্য সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া রাখিয়া ঘরে আলো বাতাস আসিতে দিতে হয়। রোগীকে ইচ্ছামত নির্ম্মল জল পান করিতে দিলে ক্ষতি নাই। রোগীর সুনিদ্রার ব্যাঘাত না হয় তৎপক্ষে সাবধান হইতে হইবে। পথ্য-সম্বন্ধে ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া ঠিক সেই মত খাইতে দিবে। ভিন্ন ভিন্ন রোগের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা যাহা ডাক্তারের নিকট জানিয়া সেই অনুসারে করিবে। সংক্রামক রোগগ্রস্ত হইলে পৃথক ঘরে রাখিয়া কি ভাবে শুশ্রূষা করিতে হয় তাহাও ডাক্তারের নিকট জানিয়া লইবে।

(৮) সন্তান-পালন ও শিক্ষা :—৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক শিশুর লালন-পালন সম্বন্ধে উপরোক্ত ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ক পুস্তকে অনেক সাহায্য পাইবে। শিশুর খাদ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইল। শিশুর দাঁত উঠার সময় নানাপ্রকার পীড়া হইয়া থাকে সেজন্য হোমিওপ্যাথী "ক্যামোমিলা" নামক ঔষধে উপকার পাওয়া যায়। কোষ্ঠবদ্ধ-ধাতুবিশিষ্ট শিশুকে কেহ কেহ পুনঃ পুনঃ ক্যাষ্টর অয়েল জোলাপ দিয়া থাকেন। ইহা নিতান্ত অনুচিত। উহাতে শিশুর এরূপ অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায় যে, জোলাপ না দিলে সে মোটেই বাহ্যে করে না। এরূপ ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথী উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগে শিশুর প্রকৃত উপকার হইয়া থাকে। এই পুস্তকের পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে।

(৯) শ্বশুরালয় :—শ্বশুর বাড়ীতে, শ্বশুর-শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনদিগকে নিজের পিতামাতার ন্যায় ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা প্রদর্শন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সর্ব্ব কাজে তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। বিনয়, নম্রতা, লজ্জাশীলতা প্রভৃতি গুণে

তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে সর্ব্বদা যত্নবতী থাকিবে। তাঁহারা তোমার স্বামীর জনক-জননী, এই কথাটী সর্ব্বদা মনোমধ্যে জাগরূক রাখিতে হইবে। নিয়ত তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা দ্বারা সন্তোষ-বিধান করিতে হইবে। তাঁহাদের পীড়া হইলে নিকটে উপস্থিত থাকিয়া পদসেবা, বাতাস করা ইত্যাদি কাজের দ্বারা কষ্টের লাঘব করিতে হইবে। তাঁহারা কিছু আদেশ করিলে অবিলম্বে সম্পাদন করিতে প্রস্তুত থাকিবে। সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে যেন কোন প্রকারে বিন্দুমাত্র তাঁহাদের অসন্তোষের কাজ তোমাদ্বারা করা না হয়। দেবদেবীর ন্যায় শ্বশুর-শাশুড়ীকে ভক্তি, ও সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে—যে আশীর্ব্বাদ তোমার ভাবী মঙ্গলের নিদান-স্বরূপ। তোমার দেওর, ননদ, ভাসুর, যা, প্রভৃতির সহিত নিজ ভাই-ভগিনীর ন্যায় ব্যবহার করিবে। দাস, দাসী ও অন্য সকলের প্রতি মিষ্ট-ব্যবহার করিবে,—যাহাতে তুমি সকলের প্রিয়পাত্রী হইতে পারিবে। এই সমস্ত আচরণে অভ্যস্ত হইতে গেলে বালিকাবয়স হইতেই সেই ভাবে শিক্ষা পাইতে হয়, নতুবা শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়া সকলেরই অপ্রিয় ও নিন্দাভাজন হইবে। উহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় হইবে।

(১০) পতিসেবা ঃ—স্বামীকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা, সেবা দ্বারা মনোরঞ্জন করা ও আদেশ পালন ইত্যাদি যাহা বিস্তৃত ভাবে পৃথক অধ্যায়ে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ; সুতরাং এস্থলে সংক্ষেপে কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। সেই অধ্যায়ে কিশোরীদিগের শিক্ষণীয় অনেক কথা বলা হইয়াছে, যাহা আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত এবং বাঙ্গালী গার্হস্থ্য-জীবনে একান্ত দরকারী। "তিনিই সুভার্য্যা যিনি গৃহকার্য্যে দক্ষা, সন্তানবতী, স্বামীর সন্তোষদায়িনী এবং মধুর-ভাষিণী"—ইহাই হিন্দুগৃহিণীর একমাত্র শিক্ষা।

(১১) সঙ্গীত-বিদ্যা :—মানব-জীবনে সঙ্গীত-বিদ্যার বিশেষ উপযোগিতা আছে। মানব-মনে সুখস্বচ্ছন্দতা-আনন্দ-শান্তি-প্রদানে সঙ্গীতের বিশেষ ক্ষমতা আছে বটে কিন্তু ইহাতে কিছু বিলাসিতা আনে সুতরাং কর্ম্মজীবনে সঙ্গীতের দ্বারা তত উপকার হয় না বরং অপকারই হইয়া থাকে একারণ আরঙ্গজেব বাদসাহ সঙ্গীতের বিরোধী ছিলেন। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের অবস্থা বিবেচনায় বিলাসিতার কোমলতা ও সুখ স্বচ্ছন্দতার পরিবর্ত্তে কর্ম্মজীবনের কঠোরতার বেশী দরকার, তাই বলিয়া সঙ্গীত বিদ্যাকে আমি কখনই ঘৃণা বা তুচ্ছজ্ঞান করি না। যে নারী সাংসারিক কর্ত্তব্য-সম্পাদন করিয়া অবসর সময়ে সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতে পারিবেন তিনি মানব-সমাজে বিশেষ প্রশংসণীয়া ও আদরণীয়া হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

(১২) ভগবানে ভক্তি :—সর্ব্বোপরি ভগবানে ভক্তি করিতে শিক্ষা করা অতি কর্ত্তব্য ; যেহেতু আর সমস্ত গুণ থাকিলেও এই একটীর অভাবে মানব-জীবন নিষ্ফল হয় এবং গার্হস্থ্য-সুখ-শান্তি একেবারেই বিলুপ্ত হয়। ভগবানে এবং দেবদেবীতে ভক্তিসূচক কয়েকটী স্তোত্র এই পুস্তকের অন্যত্র দেওয়া হইল, যাহা মাতা নিজে কণ্ঠস্থ করিয়া পুত্রকন্যাগণের সহিত সকাল-সন্ধ্যায় একত্রে সমস্বরে আবৃত্তি করিলে, মনে বিস্তর শান্তি ও সুখ পাইবে—আশা ও উদ্যম আসিবে এবং সন্তানগণ ক্রমে ভগবৎ-ভক্ত হইয়া পর-জীবনে বহু উন্নতি লাভ করিতে পারিব। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের অনেক স্থলে এরূপ প্রসঙ্গ দেওয়া আছে যাহা পাঠ করিলে পাঠিকার আধ্যাত্মিক-জীবনের উন্নতি লাভের যথেষ্ট সাহায্য করিবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়।

বালিকাগণ, ভগবানে ও দেবদেবীতে ভক্তিমতী হইবে, গুরুজন ও আত্মীয়-স্বজনে শ্রদ্ধাবতী ও স্নেহশীলা হইবে। অহঙ্কারশূন্যা, কলহ-

হীনা, অল্পভাষিণী, অচঞ্চলা, ধৈর্য্যশীলা, মিষ্টভাষিণী ও অনলসা হইতে শিক্ষা করিবে;—তবেই পর-জীবনে সুগৃহিণী হইতে পারিবে। বস্তুতঃ সুগৃহিণীর কাজের শেষ নাই। তাঁহার এত অধিক অবশ্য-করণীয় কাজ আছে, যাহার অর্দ্ধেকও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে রাত্র-দিবা পরিশ্রম করার দরকার হয়। ইহা ছাড়া তাঁহার নিজের সুখ-অসুখ আছে, রোগ-শোক আছে, শিশু-পালন আছে, আবার মাঝে মাঝে সন্তান প্রসবও আছে; সুতরাং অতি বড় কর্ম্মিষ্ঠা হইলেও সময়ে কুলায় না—আলস্যে বৃথা সময় নষ্ট করা দূরে থাকুক। বর্ত্তমান যুগের বালিকারা সে কালের নারীদিগের আচরিত সেই অযথা লজ্জা ও অযথা ভীরুতা অবশ্যই ত্যাগ করিবে যাহাতে তাহারা কালে বীরপ্রসবিনী হইয়া ভারতের মুখের কলঙ্ক-কালিমা মোচন করিতে পারিবে। এই পুস্তকের অন্যত্র "লজ্জাশীলতা" বলিয়া পৃথক একটী অধ্যায় দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে প্রকৃত লজ্জার ক্ষেত্র ও লজ্জার মাত্রা ও পরিমাণ বুঝাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে।

সে কালের নারীদের শিক্ষার অভাব, অযথা লজ্জা-ভীরুতা ও নানাপ্রকার কুসংস্কারের আমি নিন্দা করিয়াছি। সে কালের স্ত্রীলোকের মনে (অধিকাংশ পুরুষের সম্বন্ধেও তাই) স্বদেশ ও দেশ-ভক্তি বলিয়া কোনো ধারণাই ছিল না। কিন্তু তাঁহারা নিরলস ছিলেন এবং তাঁহাদের কিছুমাত্র বিলাসিতা ছিল না। তাঁহারা দুই-পয়সা-মূল্যের একপাত মাথাঘসার দ্বারা কেশ-প্রসাধন কার্য্য সমাধা করিতেন। বেসম, রিঠা, সরিষার খইল দ্বারা অঙ্গ পরিষ্কৃত করিতেন এবং এক পয়সার আল্‌তা-পাতা দ্বারা চরণ-রঞ্জিত করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু এ কালের স্ত্রীলোকে, নানাবিধ সুগন্ধি

কেশতৈল, পমেটাম্, ভিনোলিয়া, সুগন্ধি-সাবান এমন কি সুগন্ধি তরল-আলতা দ্বারা সেই সেই কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। সে কালের নারীদের বেশভূষাও সামান্য রকম ছিল কিন্তু এ কালে নানাপ্রকার মূল্যবান্ সাজ-পোষাক নহিলে চলে না। এ সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ কালের নারীরা অযথা বহু অপব্যয় করিয়া থাকেন, যাহা আমার বাল্যকালে কোন স্ত্রীলোকের কল্পনাতেও আসিত না। তাঁহারা সমস্ত বিষয়েই মিতব্যয়ী ভাবে সংসার চালাইতেন। আমি আশা করি বর্ত্তমান বালিকারা, তাঁহাদের আচরিত দোষগুলি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের গুণগুলি গ্রহণ করিবে। তবে একটী বিষয় লইয়া আমাদের আনন্দের হেতু আছে। আজকালকার নারী-সমাজে স্বদেশ-ভক্তি ক্রমে জাগরিত হইতেছে। আজকাল অনেক স্ত্রীলোকে ইতঃপূর্ব্বের সেই জাঁকজমক বিশিষ্ট মূল্যবান্ পোষাক ত্যাগ করিয়া খদ্দর পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিদেশজাত-দ্রব্যে-ঘৃণা এবং স্বদেশে উৎপন্ন দ্রব্যে আগ্রহ, স্ত্রী-পুরুষ মধ্যে ক্রমেই ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু এই প্রবৃত্তি বর্ত্তমানে সূচনা মাত্র বলিতে হইবে। যখন ঘরে ঘরে চরকা ঘুরিবে, ঘরে ঘরে তাঁত চলিবে, ঘরে-ঘরের-আবশ্যক বস্ত্রাদি ঘরেই প্রস্তুত হইতে থাকিবে, যখন অন্ন-বস্ত্রাদি জীবন-ধারণের জিনিসগুলির জন্য বিদেশের মুখের দিকে তাকাইতে হইবে না, বিলাসিতা অশুচিবৎ পরিত্যক্ত হইবে তখনই আমাদের স্বরাজ লাভের দাবী সার্থক হইবে ; এবং তখনই আমরা প্রকৃত স্বরাজ লাভের যোগ্য বিবেচিত হইব এবং স্বরাজ অর্জ্জন করিবার সামর্থ্য জন্মিবে। কিন্তু এ কার্য্যের প্রধান সহায় স্ত্রীজাতি। নারীর দ্বারা উৎসাহিত না হইলে,—শক্তিরূপিণী নারীজাতি পুরুষকে শক্তি প্রদান না করিলে,

পুরুষের সাধ্য কি সেই পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বর্গের স্বরাজধামে প্রবেশ করে ?

উপরোক্ত বিষয়গুলি এবং উহা ছাড়া আরো অনেক আবশ্যক বিষয় বালিকাকে শিক্ষা দিতে হইবে, যেন সেই বিদ্যা-প্রভাবে সে পরে, সুমাতা ও সুগৃহিণী হইয়া নারীজীবন সার্থক করিতে সমর্থা হয়। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের লোকের ধারণা ছিল যে, যে কোন প্রকারে পুত্রকেই শিক্ষিত করিয়া, যে কোন প্রকারে চাকরীতে ঢুকাইতে পারিলেই পিতার কর্ত্তব্যের শেষ হইল ; আর কন্যাসন্তান, তুচ্ছ, ঘৃণিতভাবে ঘরের কোণায় পড়িয়া থাকিত, অথবা মায়ের সাংসারিক কাজের যথাসাধ্য সাহায্য করিত এবং নিজের ছোট ছোট ভাইভগিনীগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিত। কন্যাকেও উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিতা করা কর্ত্তব্য একথা কাহারো মনে এতদিন পর্য্যন্ত উদয় হয় নাই—যদিও মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—"কন্যাপেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।" কিন্তু একথা একাল পর্য্যন্ত কেহই গ্রাহ্য করে নাই। যাহাহউক ভগবানের কৃপায় লোকে এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছে "নারী না জাগিলে ভারত জাগিবে না।" বস্তুতঃ সুমাতা না হইলে কখনই সুসন্তান হইতে পারে না সুতরাং সমাজের উন্নতি হইবে না। মহাকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর অতি দুঃখে ও ক্ষোভের সহিত বঙ্গমাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :—

"সাত কোটি সন্তানেরে হেমুগ্ধ জননি !
রেখেছ বাঙ্গালী ক'রে মানুষ করনি।"

আমরা আশা করি, এই নব প্রণালীতে শিক্ষিতা নবযুগের ভাবী মাতৃকাদল, ভগবানের আশীর্ব্বাদে নিজ নিজ ভাবী সন্তানগণকে

"মানুষ" করিয়া গঠন করিতে সক্ষমা হইবেন। তখন তাহা দেখিয়া অবশ্যই মহাকবির স্বর্গীয় আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করিবে।

১৩৩৪ সালের আশ্বিন মাসের "মাতৃ-মন্দির" নামক মাসিক পত্রিকায় শ্রীমতী হেমলতা দেবী "নারীর-উন্নতিতে ভগবৎ-প্রেরণা" শীর্ষক সুন্দর প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিয়া, আমার এই "নব যুগের নারী-শিক্ষা" প্রবন্ধের যথেষ্ট গৌরব বৃদ্ধি করা হইল :—

"ভগবানের মঙ্গল-শক্তিতে নির্ভর ক'রে—সেই অচল, অটল ধ্রুব শক্তিকে আশ্রয় ক'রে, মেয়েরা আজ পৃথিবীর সাম্‌নে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে! তাহারা মর্‌ছিল—রোগে, শোকে, দুঃখে, অপমানে, নির্য্যাতনে, উৎপীড়নে, অজ্ঞানে,—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মর্‌ছিল—ঘরে ঘরে যেন নারী-মৃত্যুর উৎসব চল্‌ছিল। এ দেশে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম—যেন সেই নারী-মৃত্যুর করাল নৃত্যে প্রথম মঙ্গল-শক্তির আবির্ভাব। সেই থেকে স্রোত উল্টা দিকে ফিরেছে—মেয়েরা বাঁচ্‌তে সুরু করেছে। যদিও এখনও মৃত্যুর বিরাম নাই,—এখনও কোটি কোটি মেয়ে, দুঃখে, মর্ম্মপীড়ায়, অযত্নে, অচিকিৎসায়, অজ্ঞানতায়, অশিক্ষায়, দুর্দ্দশার একশেষ হ'য়ে মারা যাচ্ছে—কিন্তু গতি ফিরেছে, মেয়েদের বাঁচিবার দিকে গতি ফিরেছে—ভগবানের চির-বিজয়ী মঙ্গল-শক্তির জয়যাত্রা সুরু হয়েছে। পৃথিবী জুড়ে সাড়া পড়ে গেছে—মেয়েদের বাঁচ্‌তে হবে। শুধু প্রাণে বাঁচা নয় - জ্ঞানেও বাঁচ্‌তে হবে—মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকারে বাঁচ্‌তে হবে। মেয়েদের অন্তর থেকে অন্তরাত্মা সেই প্রেরণা যোগাচ্ছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা, সেই প্রেরণা-অনুযায়ী শিক্ষা, দীক্ষা ও কাজে, অগ্রসর হ'য়ে পড়্‌ছে। নানাদিক থেকে নানা কর্ম্ম, চেষ্টা, জাগ্রত হয়েছে।

মেয়েদের জীবন থেকে অমঙ্গল দূর হয়ে, কিসে তারা মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তার নানা আয়োজন চল্‌ছে। যাঁরা এই আয়োজনের অনুষ্ঠাতা, অনুষ্ঠাত্রী, তাঁদের জীবন ধন্য, কারণ তাঁরা প্রত্যেকে ভগবানের এই অনির্ব্বচনীয় মঙ্গল শক্তি অন্তরে ধারণ করে আছেন। আয়োজন ক'রে, অনুষ্ঠান সুরু ক'রে, তাঁরা দেশ-বাসীদের ডাক দিচ্ছেন, "সকলে এস, সকলে এই মঙ্গল শক্তির কর্ম্ম-পতাকা নিজের নিজের হাতে গ্রহণ কর, দেশ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করুক।"

মৃত্যু থেকে বাঁচ্‌বার একমাত্র উপায়, ভগবৎ-প্রেরিত এই মঙ্গল-শক্তির আশ্রয় লাভ করা। মেয়েরা বাঁচ্‌লে, পুরুষেরাও সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে উঠ্‌বেন। মেয়েদের স্বভাব—আত্মদান। প্রেম, তাদের ধর্ম্ম, আর প্রেমের ধর্ম্ম—ত্যাগ। মেয়েরা যা পাবে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত পৃথিবীকে তা দান কর্‌বে—প্রাণ পেলে প্রাণ, জীবন পেলে জীবন, জ্ঞান পেলে জ্ঞান, মুক্তি পেলে মুক্তি, স্বাধীনতা পেলে স্বাধীনতা। মেয়েদের জিনিস,—সমস্ত পৃথিবীর জিনিস হবে পর মুহূর্ত্তে। যদি কোন কিছু সকলের ক'রে দিতে চাও, তবে আগে সেটী মেয়েদের ক'রে দাও। তাহারা যখন যা পৃথিবীকে দেয়, নিজেকে একেবারে নিঃস্ব ক'রে—উজাড় ক'রে দেয়—সাধ্বীর স্বামী, সতীর সন্তান মাত্রেই জানেন, একথা কত সত্য। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই মেয়েদের এই অমূল্যত্যাগ বা আত্মদানের অবমাননা, লাঞ্ছনা ঘরে ঘরে, পদে পদে ঘটে। তার ফলে সকল প্রকার দুঃখ, পীড়া, অধীনতায়, পৃথিবী জর্জ্জরিত। মেয়েদের অপরিসীম দুঃখ-মোচনের জন্য, পৃথিবীর বুকের উপর থেকে এই ভীষণতর চাপ সরিয়ে দেবার জন্য, পৃথিবীর গভীর অন্তর

থেকে, আজ এই মঙ্গল-শক্তির প্রেরণা। অন্তর্য্যামী, অনন্ত থেকে সকলকে জাগাচ্ছেন, বল দিচ্ছেন, জ্ঞান দিচ্ছেন—ফলে,—জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, স্কুল সমিতি ইত্যাদি গঠন ও আরো নানা-উপায় অবলম্বন দ্বারা মেয়েদিগকে বাঁচাবার চেষ্টা চল্‌ছে। জ্ঞান, ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য, মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ, আত্মার ভাব যদি মেয়েদের জীবনে ফুটে ওঠে, তবে দেশ আপনা-আপনি রক্ষা পাবে সন্দেহ নাই। সকলে এ কাজে যোগ দিন, মেয়েদের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারে সকলে সহায় হোন্, পৃথিবীতে ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।

এক বাংলাদেশে—নারী-শিক্ষা-সমিতি, তার অন্তর্গত বিদ্যাসাগর বাণী ভবন (একটী বিধবা আশ্রম) শিল্পাশ্রম, সরোজ-নলিনী-স্মৃতি-সমিতি, হিরণ্ময়ী-বিধবা-শিল্পাশ্রম, ভারতস্ত্রীমহামণ্ডল, গৌরীমাতা-আশ্রম, নিবেদিতা-স্কুল, ভিক্‌টোরিয়া-স্কুল, বেথুন-স্কুল, মহাকালী পাঠশালা, দীপালি-সমিতি ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়, রাজরাজেশ্বরী বালিকা-বিদ্যালয়, বীণাপাণি বালিকা-বিদ্যালয়, মারোয়াড়ী বালিকা-বিদ্যালয়, চন্দননগরে—কৃষ্ণভামিনী-নারী-শিক্ষা-মন্দির, কলিকাতায়—কৃষ্ণভামিনী বালিকা-বিদ্যালয়, করপোরেশন-স্থাপিত অনেকগুলি অবৈতনিক-বালিকা-বিদ্যালয়, ঢাকা, বিধবা-আশ্রম, পতিতাশ্রম, গভর্ণমেণ্ট-স্থাপিত-হিন্দুবিধবা-ট্রেণিং স্কুল, আরো নানা আশ্রম, স্কুল আছে, (উপস্থিত সে গুলির নাম স্মরণ নাই) এ ছাড়া ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর নানা প্রদেশে মেয়েদের জ্ঞানলাভের জন্য বহু বহু স্কুল কলেজ স্থাপিত আছে—এই সবগুলির শুভ চেষ্টা সফল হোক্—সমুদায় অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানগুলি নিঃস্বার্থ মঙ্গল-বুদ্ধির দ্বারা অর্থাৎ ভগবৎ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হোক্ এই আমার প্রার্থনা।

স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহোদয় ভবানিপুরস্থিত, দানকৃত-নিজ-ভূতপূর্ব্ব-বসত-বাটীতে দাতব্য নারী-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত-স্ত্রীদিগের অশেষ উপকারসাধন করত, অক্ষয় কীর্ত্তিস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ঐ চিকিৎসালয়ে, স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় নানা মূল্যবান্ উপদেশ ও জ্ঞাতব্য বিষয়, সাধারণ স্ত্রীলোকের সহজে বোধগম্য ও মনে অনায়াসে ধারণা করার উদ্দেশ্যে, সুন্দর সুন্দর চিত্র-সমন্বিত করিয়া রক্ষিত হইয়াছে, যাহা আমি তথাকার প্রধান ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র মিত্র মহোদয়ের সৌজন্যে দেখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ঐ সমস্ত মূল্যবান্ উপদেশ ও জ্ঞাতব্য বিষয় আমার যথাসম্ভব মন্তব্য দ্বারা বিস্তার করিয়া, বালিকা ও তরুণীদিগের শিক্ষা জন্য এস্থলে দেওয়া কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলাম।

১। গ্রামই জাতির প্রাণ। শতকরা ৯৪ জন লোক গ্রামে বাস করিয়া থাকে; অতএব গ্রামগুলিকে স্বাস্থ্য-সম্পন্ন ও সজীব করিতে পারিলে, জাতি বাঁচিয়া উঠিবে। দেশের মোট অধিবাসীর শতকরা ৬ জন মাত্র লোক সহরে বাস করিয়া থাকে।

২। দেশ-বিদেশের গড়পড়তা আয়ু সংখ্যা এইরূপ:—আমেরিকা ৫৬ বছর, ইংলণ্ড ৫০ বছর, ডেনমার্ক ৪৮ বছর, জাপান ৪১ বছর, আর ভারত? শুনিলে স্তম্ভিত হইবে, ভারতবর্ষের লোকের গড়পড়তা আয়ু সংখ্যা মোটে ২৩ বছর মাত্র। এখানে

"গড় পড়তা" কথাটা একটু ভাল ক'রে বুঝাইয়া দিতে হইল। মনে কর পূর্ব্বে কোন এক বাড়ীতে ৫ জন লোক বাস করিত কিন্তু তাহারা সকলেই মরিয়া গিয়াছে—কেহ মরিয়াছে ৬২ বছরে, কেহ মরিয়াছে ৪৭ বছরে, কেহ মরিয়াছে ২৩ বছরে, কেহ মরিয়াছে ৭ বছরে আবার কেহ মরিয়াছে ১ বছরে; অর্থাৎ সেই বাড়ীর লোকেরা গড় পড়তা ২৮ বছরে মারিয়াছে; যেহেতু ঐ ৬২+৪৭+২৩+৭+১=১৪০ হইল। এই যোগফলকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে ২৮ সংখ্যা পাওয়া গেল, ইহাই গড়পড়তা। সেইরূপ এই ভারতবর্ষের যেখানে যতলোক মরিয়াছে সব, থানায় থানায় লেখা আছে, কতজন লোক মরিয়াছে আর তাহারা কে কত বছর বয়সে মরিয়াছে। তাহা হইতেই পরে হিসাব করিয়া দেখা গেল, ভারতবর্ষের অধিবাসীর গড়পড়তা আয়ু সংখ্যা মোটে ২৩ বছর।

৩। বাংলাদেশে এত ম্যালেরিয়া কেন? প্রথমতঃ বাংলাদেশের অধিকাংশই নিম্নভূমি। এখানে বিল, ঝিল, জলাভূমি অনেকস্থানে আছে; মশারা জল নহিলে ডিম পাড়িতে পারে না সুতরাং বাংলাদেশের সর্ব্বত্রই অত্যন্ত মশকবৃদ্ধি। এখন, মশাতেই ম্যালেরিয়া-বিষ পরিচালনা করে, তা সকলেই জানে। দ্বিতীয়তঃ পল্লীগ্রামের বাড়ীগুলির চারিপাশে প্রায়ই ঝোপ, জঙ্গল, খানা ডোবা প্রভৃতি থাকে, যেখানে মশার উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও অবস্থানের যথেষ্ট সুবিধা পায়। সুতরাং পল্লীগ্রামের বাড়ীগুলিতে দিবারাত্রি মশার উপদ্রব। মশারা, ম্যালেরিয়া-বিষগ্রস্ত লোকের রক্ত খাইয়া আসিয়া সুস্থ লোকের গায়ে বসিয়া সেই বিষ ঢালিয়া দেয়, সুতরাং তাহাদেরও ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। যত মশা দেখা যায় সবই যে ম্যালেরিয়া বিষ পরিচালন করে তাহা নহে। কোন কোন মশার এই ক্ষমতা

আছে, আবার কোন কোনটা কেবল রক্ত খাইয়াই উড়িয়া যায়। কিন্তু কে ভাল কে দোষী তাহা যখন বিনা-অনুবীক্ষণ-যন্ত্র-সাহায্যে আমরা সহজে চিনিতে পারিনা তখন মশা-মাত্রেই দোষী বলিয়া সাবধান থাকা নিরাপদ। মশার প্রতাপে বাংলাদেশে প্রতি মিনিটে ২ দুই জন লোক অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ২০০০ দুই হাজার লোক মারা যায়। কি ভীষণ ব্যাপার!

৪। ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়ঃ—বাটীর নিকটস্থ ঝোপ, জঙ্গল পরিষ্কার করা, খানা, ডোবা, নালা, প্রভৃতি যেখানে যেখানে বর্ষার জল জমে, সে সব ভরাট করা; বাড়ীর আশে পাশে ভাঙা হাঁড়ী, মালসা, নারিকেল মালা, প্রভৃতি যেখানে যেখানে বর্ষার জল জমাতে মশারা ডিম পাড়ার সুবিধা পায়, সে গুলি সব দূরে সরাইয়া ফেলা, অগত্যা উপুড় করে রাখা, মশারি খাটাইয়া শয়ন, ঘরের দরজা জানালায় পাতলা পর্দা দেওয়া, যাহাতে রৌদ্র বাতাস আসিতে পারে অথচ মশা মাছি আসিতে না পারে; আর অবস্থা-অনুসারে ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া কুইনাইন সেবন করা।

৫। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব সময়ে অর্থাৎ বাংলাদেশে ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে সাবধানে থাকিতে হইবে। শীতল জলে স্নান, বৃষ্টিতে ভেজা, ভিজা কাপড় অঙ্গে রাখা, রৌদ্র-ভোগ গুরুভোজন, দিবানিদ্রা, রাত্রি-জাগরণ, শিশির-লাগানো, বাহিরে শয়ন, বিনা মশারিতে নিদ্রা ইত্যাদিতে ম্যালেরিয়া আক্রমণের সাহায্য করে।

৬। কিরূপে কলেরা বিস্তার-লাভ করেঃ—কলেরা রোগীর বমি, মল পুকুরে ফেলা কিম্বা ঐ সব মাখা কাপড় বিছানা যদি পুকুরে কাচা হয় এবং সেই জল যত লোকে খায় সকলেরই কলেরা হয়। আর

সেই বমি মলে মাছি বসিয়া সেই মাছি যাহাদের খাদ্যে বসে তাদেরও কলেরা হইয়া থাকে।

৭। কলেরা বিস্তার নিবারণের উপায়ঃ—কলেরা রোগীর বমি ও মল, হয় পোড়াইয়া ফেলিতে হয় অথবা মাটীতে পুতিতে হয়। বমির পাত্র, এবং মলের কাপড়, বিছানা ফিনাইল দ্বারা বেশ ক'রে ধুইয়া লইতে হয় অথবা বহু দূরে ফেলিয়া দিতে হয়, কদাচ পুকুরে কি নদীর জলে কাচিতে নাই। কাপড়, বিছানা ধোয়া জল আবার যেন পুকুরে গিয়া না পড়ে, এরূপ দূরে জল তুলিয়া লইয়া গিয়া ঐ সব ধুইতে হয়। সেবা-শুশ্রূষাকারীরা উত্তমরূপে সাবান দ্বারা হাত না ধুইয়া যেন কিছু আহার না করে। আহার্য্য-সামগ্রী সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখা উচিত যেন তাহাতেও ভোজনকালে পাতে মাছি না বসিতে পারে। বাংলাদেশে প্রতিদিন গড়পড়তা ২০০ দুই শত লোক কলেরা দ্বারা মারা যায়, যাহা চেষ্টা করিলে যথেষ্ট কমানো যাইতে পারে।

৮। কলেরার প্রাদুর্ভাব সময়ে কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্যঃ—বালি-কয়লার দ্বারা পরিষ্কৃত জল অথবা গভীর কূপের নির্ম্মল জল, অথবা পুকুরের জল ফুটাইয়া লইয়া কর্পূর-বাসিত করে পান করিতে হয়। নিমন্ত্রণ খাওয়া, কি গুরু ভোজন, রাত্রি জাগরণ, কলেরা রোগীর সংস্পর্শে থাকা, মনে ভয় পাইয়া ফুর্ত্তি ও উৎসাহ-শূন্য হওয়া নিতান্ত অন্যায়। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া মনে সাহস করিতে হয়, আমোদ-আহ্লাদে ব্যাপৃত থাকিয়া, লঘু আহার করিয়া থাকা, অথবা স্থান-ত্যাগ করা ভাল। "রুবিনী ক্যাম্ফার" অর্থাৎ কর্পূরের আরক, প্রত্যেক পাতলা বাহ্যের পরে, পূর্ণ বয়স্কের জন্য ৫ ফোঁটা করিয়া, একটু চিনির সহিত

খাইলে কলেরার প্রারম্ভে প্রায়ই রোগী সারিয়া উঠে। আর আর লক্ষণ যাহা দেখিয়া কর্পূরের আরক দিতে হয় তাহা এই :— বাহ্যের পরে নিতান্ত দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা বোধ হওয়া, শীত বোধ, হাত পা অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও আঙ্গুল রক্তহীন হইয়ে চুপ্‌সে যাওয়া, নখ নীলবর্ণ, হাতে পায়ে খিল ধরা ও পেটে ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণে কর্পূরের আরক বেশ ভাল ও বহু পরীক্ষিত ঔষধ অথচ দামও তত বেশী নহে সুতরাং সকলেই রাখিতে পারে। মাত্রা বয়স্ক লোকের জন্য ৫ হইতে ১০ ফোঁটা, বালকের তাহার অর্দ্ধেক এবং শিশুর, সিকি মাত্রা, ১৫।২০ মিনিট অন্তর অন্তর অথবা প্রত্যেক বাহ্যের পরে দিতে হয়। এই ঔষধ মূর্চ্ছাতেও কম মাত্রায় খাইতে দিয়াও শোঁকাইলে মূর্চ্ছা ভাঙ্গে আবার বোল্‌তা; ভীমরুল, মৌমাছি, বিছা প্রভৃতিতে কামড়াইলে স্থানীয় বাহ্য-প্রয়োগে উপকার হইতে পারে। কলেরার প্রথম ভাগে এই ঔষধে ক্রমে ভাল হওয়ার লক্ষণ না দেখিলে অবিলম্বে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারকে সংবাদ দিবে অথবা এলোপ্যাথিক ইনজেক্‌সন করাইবে।

৯। বসন্ত রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে উপযুক্ত সময়ে টীকা লইতে হয়। বসন্ত বড় ছোঁয়াচে রোগ। ইহার সংস্পর্শে আসিলে নিশ্চয় ঐ রোগ হইয়া থাকে। মাছি দ্বারা অনেক সময় বসন্ত বিস্তার লাভ করে। মাছি, বসন্ত রোগীর গায়ে বসিয়া কিম্বা বসন্ত ক্ষতের পুঁজরক্ত মাখা তুলা, যাহা অনেক সময় লোকে না বুঝিয়া যেখানে সেখানে ফেলে, তাহাতে বসিয়া ঐ মাছি যাহার গায়ে কিম্বা বিছানা-কাপড়ে বসে তাহারও বসন্ত হইয়া থাকে। একারণ ঐ সব পুঁজ-রক্ত-মাখা-তুলা ইত্যাদি পোড়াইয়া কিম্বা পুতিয়া ফেলিতে হয়।

১০। প্রসব হইবার জন্য পরিষ্কার, শুক্‌না, দুর্গন্ধহীন, রৌদ্র-বাতাস যায় এরূপ ঘর দিতে হয়। সুশিক্ষিতা, পরিপক্ক ধাত্রী নিযুক্ত করিতে হয়, তবেই পোয়াতী এবং শিশু উভয়ই রক্ষা পাইবে। অশিক্ষিতা ধাইএর হাতে, অন্ধকার, দুর্গন্ধময়, অস্বাস্থ্যকর ঘরে অনেক পোয়াতী মারা যায়। বাঁশের ময়লা "ফলা" অর্থাৎ চেঁচাড়ি দিয়া নাড়ী কাটিলে শিশুর ধনুষ্টঙ্কার রোগ হয়। ধাত্রীর দোষে, মাতার অজ্ঞানতায়, অস্বাস্থ্যকর আঁতুড় ঘরে ভারতবর্ষে প্রতি মিনিটে গড়ে ৪টী শিশু মারা যায়; যাহারা উপযুক্ত ভাবে শুশ্রূষা করা হইলে নিশ্চয় বাঁচিত। প্রতিদিন বাংলাদেশে গড়ে ২০০ দুই শত নারী, প্রসব-সংক্রান্ত পীড়ায় মারা যায়। ইহার অনেক অংশ কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতা হেতু ঘটিয়া থাকে।

১১। শিশুর খাদ্য:—প্রথম ৬ মাস, শিশুর পক্ষে কেবল মাতৃস্তন্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। ৬ মাস বয়সের পরে মাতৃস্তন্য শিশুর পক্ষে তত উপকারী নহে; যেহেতু তখন স্তন্যদুগ্ধ পাতলা হইয়া পড়ে; এবং কেবল ঐ দুধ খাইয়া থাকিলে শিশু ফ্যাকাশে হয়। তখন ছাগলের দুধে জল মিশাইয়া অথবা গরুর দুধের সঙ্গে সাগু, বার্লি, শঠির পালো মিশাইয়া খাওয়ান যাইতে পারে। শিশু কাঁদিলেই যে তাহাকে খাওয়াইতে হইবে এমন কোন হেতু নাই। হয়ত শিশু পেট কামড়ানো জন্য কাঁদিতেছে তখন তাহাকে খাওয়াইলে আরো মন্দ ফল হয়। মাখন তোলা আর চিনি মিশানো "বিলাতি দুধ" টীনের কৌটায় করিয়া বাজারে যাহা বিক্রী হইয়া থাকে উহা কত কালের পুরাণো তার ঠিক নাই। শিশুকে ঐ সব খাওয়াইলে তাহার স্বাস্থ্যহানি হয়। মাখম তোলা দুধে চিনি ও অন্য

কত জিনিস মিশাইয়া বাজারে "ফুড" বলিয়া যে সমস্ত শিশুর খাদ্য বিক্রী হইয়া থাকে; ঐ সব না খাওয়ানই ভাল। অবশ্য দেখা গিয়াছে উহা খাইয়া ধাতু-বিশেষ কোন কোন শিশু একটু মোটা-সোটা হয় বটে, কিন্তু তথাপি ঐ শিশু একেবারেই অন্তঃসার-শূন্য হইয়া থাকে। আবার অনেক শিশু উহা খাইয়া কঠিন পেটের পীড়ায় বহু দিন যাবৎ ভুগিয়া থাকে। সুস্থ সবল শিশু পাইতে হইলে, উত্তম-আহার-প্রাপ্ত-গাভীর টাট্‌কা দুধ খাওয়াইতে হয়। সদ্য প্রসূত শিশুর জিহ্বায় আঙ্গুলে করিয়া সামান্য একদুই ফোঁটা ভাল মধু দিবে এবং গরুর দুধে বেশী জল দিয়া গরম করিয়া একটু একটু ৩।৪ দিন খাওয়াইলেই তার মার স্তনে দুধ আইসে।

১২। মার কোলে ছেলের শিক্ষার আরম্ভ হয়। মা, যে ছেলেকে "ঐ জুজু" বলিয়া মিথ্যা ভয় দেখান, সে ছেলে বড় হইয়া ভীরু, কাপুরুষ ও কুসংস্কারী হইয়া থাকে। আবার মা, যে ছেলেকে সাহস দিয়া থাকেন, সে ছেলে পরে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ পাইয়া সাহসী হয়। ঐরূপ ছেলের দ্বারা পরে মনুষ্য-সমাজের যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। বিপদে পতিত-লোককে সেই ছেলেই উদ্ধার করিয়া থাকে। মায়ের কোলই শিশুর প্রথম পাঠশালা। মায়ের চরিত্র ও জ্ঞান, অজ্ঞাতসারে শিশুর চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

১৩। সর্ব্বদা দাঁতের যত্ন করা উচিত। দাঁত শক্ত থাকিলে ভাল চিবাইতে পারা যায় কাজেই ভাল হজম হয় এবং শরীর পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। অপরিষ্কার দাঁত, নানারকম অসুস্থতা আনে। প্রতি ৫ জন ছাত্রের মধ্যে একজনের দাঁত খারাপ। ডাক্তারেরা বলেন, দাঁত ভাল থাকিলে অর্দ্ধেক রোগ হইতে পারে না। অতএব

সকলে দাঁতের প্রতি যত্ন করিও। প্রবাদ আছে "লোকে দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না।"

১৪। যেখানে সেখানে থুথু, গয়ের ফেলিতে নাই। বাহ্যে, প্রস্রাব যেমন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া করিতে হয়, সেইরূপ থুথুও নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফেলিতে হয়। যক্ষ্মারোগীর থুথু গয়ের, জীবাণু-ধ্বংসকারী-ঔষধ-দেওয়া-পাত্রে অথবা চূণের পাত্রে ফেলিয়া তাহা দূরে মাটীর নীচে পুতিয়া ফেলিতে হয়। যক্ষ্মারোগীর থুথু, ঘরের মধ্যে যেখানে সেখানে ফেলিলে, পরে ঐ থুথু শুকাইয়া বাতাসের সঙ্গে মিলিয়া অন্য সুস্থ-লোকের নিশ্বাস-সহ ফুস্‌ফুসে যাওয়াতে তাহারও যক্ষ্মা হইয়া থাকে।

১৫। প্রতিদিন বাংলাদেশে গড়ে ১২০ জন লোক, পেটের পীড়ায় মারা যায়, যাহা সাবধান হইলে অনেক কমান যাইতে পারে।

১৬। কলিকাতা সহরে ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়সের মধ্যে গড়ে ৫ জন যদি যক্ষ্মারোগে মারা যায়, তবে তার মধ্যে ৪ জন স্ত্রীলোক ঐ রোগে মরে। ইহা দ্বারা বোঝা যায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর মধ্যে যক্ষ্মা ৪ গুণ অধিক হইয়া থাকে। যক্ষ্মারোগে প্রতি ৫ মিনিটে গড়ে একটী করিয়া বাঙ্গালী মরিতেছে।

১৭। বাংলাদেশে যত কুষ্ঠরোগী আছে, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে তত নাই। বাংলাদেশে ১৫,৪৫০ জন কুষ্ঠ রোগী আছে, যাদের জন্য মাত্র ১১টী আশ্রম; যাহার ৩টী আশ্রম খৃষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত। কুষ্ঠরোগ ভয়ানক ছোঁয়াচে। কুষ্ঠ-রোগীর ব্যবহৃত-পয়সা, খাবার দিবার জন্য তাদের হাতে তৈরি ঠোঙ্গা, তাদের-প্রস্তুত-খাবার সমস্তই ঐ রোগ বিস্তার করিয়া থাকে।

১৮। কলিকাতায় যত লোক মরে তার মধ্যে গড়ে ১০ জনের মধ্যে একজন ক্ষয়রোগে মরিয়া থাকে।

১৯। কিসে কিসে রোগ আরোগ্য হইবার পক্ষে সাহায্য করিয়া থাকে ঃ—বিশ্রাম, নিদ্রা, উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষা, সুপথ্য ও সুনির্ব্বাচিত ও উপযুক্ত-গুণযুক্ত ঔষধ। ডাক্তারে রোগীর অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিতে পারেন কিন্তু রোগীর জীবন সেই সমস্ত ব্যবস্থা-অনুযায়ী সেবা-শুশ্রূষা, ঐরূপ পথ্য দেওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদির উপর। সুতরাং সেবাকারীর উপর রোগীর জীবন নির্ভর করিতেছে বলিতে হইবে। দক্ষ, কষ্ট-সহিষ্ণু, নিজের সুখস্বচ্ছন্দতা-ত্যাগী, রোগীর উপর মায়া-মমতা-বিশিষ্ট, অচঞ্চল, বেশী-কথা-কয়না, রোগীর ইঙ্গিত-বোঝে, সম্মুখে "হা হুতাশ" করিয়া রোগীর মনে ভয় দেয়না সেইরূপ সেবাশুশ্রূষা-কারী-নিযুক্ত করিতে হয়।

২০। স্বাস্থ্যলাভের সহায় ঃ—রৌদ্র, বিশুদ্ধ বাতাস, শুষ্ক বাসগৃহ, বিশ্রাম, নিদ্রা, চর্ব্বণ, নাসিকাদ্বারা শ্বাস-গ্রহণ, আমোদ, খেলা, স্নান ও যথা উপযুক্ত কাজে ব্যাপৃত থাকা।

২১। জল ফুটাইয়া লইয়া ঠাণ্ডা করিয়া পানকরা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। ইহা দ্বারা কলেরা, আমাশা প্রভৃতি সংক্রামক পীড়া হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। জল ফুটাইয়া রাখিয়া দিলে, খানিক পরে দেখা যায় তলায় কত ময়লা জমিয়া রহিয়াছে; অফুটন্ত জল পান করিলে ঐ সমস্ত অবশ্যই উদরস্থ হইত। পল্লীগ্রামে বাঁশ দিয়া ফ্রেম করিয়া ৪টী কলসী উপরে উপরে রাখিয়া বালি কয়লাদ্বারা জল পরিষ্কার করার যে কৌশল করা হয়, তাহাতে বেশ নির্ম্মল জল পাওয়া যায়। যে বাড়ীতে বেশী লোক, তথায়

ঐরূপ ২।৩ টা থাকিলেই হইতে পারে। সকলের উপরের কলসীতে নদীর কিম্বা পুকুরের জল ফুটাইয়া লইয়া ঢালিতে হয়, দ্বিতীয় কলসীতে কয়লাপূর্ণ থাকে এবং তৃতীয় কলসীতে বালি থাকে। আর শেষ কলসীতে পানের উপযুক্ত নির্ম্মল জল বিন্দু বিন্দু পড়িয়া জমিয়া থাকে। নলকূপ করা সব চেয়ে ভাল; ২০০৲ ২৫০৲ টাকা ব্যয়ের মধ্যে হইতে পারে।

২২। শিশুর নিজের দোষে নহে, পরন্তু পিতা মাতার দোষেই অনেক শিশু জন্মান্ধ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে।

২৩। বাংলা দেশের মৃত্যুর হার কতকটা এইরূপ :—

গড়ে প্রতি ১ মিনিট অন্তর ২ জন করিয়া বঙ্গবাসী ম্যালেরিয়ায় মারা যায়
,, ,, ৩ ,, ,, ১ ,, ,, নিউমোনিয়ায় ,,
,, ,, ৪ ,, ,, ১ ,, ,, ওলাউঠায় ,,
,, ,, ৪ ,, ,, ১ ,, ,, আমাশায় ,,
,, ,, ৫ ,, ,, ১ ,, ,, ক্ষয়রোগে ,,
,, ,, ৮ ,, ,, ১ ,, ,, সূতিকারোগে,,
,, ,, ১৫ ,, ,, ১ ,, ,, ধনুষ্টঙ্কারে ,,
,, ,, ৩০ ,, ,, ১ ,, ,, কালাজ্বরে ,,
,, ১ ঘণ্টা ,, ,, ১ ,, ,, টাইফয়েডে ,,

২৪। এদেশে প্রতি মিনিটে ৪টী এবং প্রতি ঘণ্টায় ২৪০টী এবং প্রতিদিন ৫৭৬০টী শিশু মৃতু-মুখে পতিত হইয়া থাকে।

২৫। আমাদের দেশে প্রতি ১০০টী মৃত্যু ঘটিলে বুঝিতে হইবে উহার মধ্যে ৬০জন মরিয়াছে অবহেলা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের জন্য। আর এদেশে ৩০ বছর বয়সের মধ্যেই শতকরা ৬৫ জন স্ত্রীপুরুষ মারা যায়। এখানে গড়পড়তা ১০ জন মাত্র লোক ৬০ বছরের উপর বাঁচিয়া থাকে।

আকস্মিক দুর্ঘটনা।

এই সংসারে বাস করিতে হইলে সময় সময় দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে, যাহার যথাসাধ্য, যথাসম্ভব প্রতিকার-চেষ্টা (ডাক্তার আসার পূর্ব্বে) নিজেরা করিতে পারিলে অনেক সময় প্রভূত মঙ্গল-জনক হইয়া থাকে। একারণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র বসু মহোদয়ের সম্পাদিত "স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম গৃহ-পঞ্জিকা" হইতে নিম্নলিখিত দুর্ঘটনাগুলি সম্বন্ধে প্রথম সাহায্যদানের প্রণালী বিষয়ক উপদেশ সংক্ষেপে বলা হইতেছে। সকলের ঐ পঞ্জিকায় বিস্তারিত ভাবে দেখিয়া শিক্ষা করা অতি কর্ত্তব্য।

১। রক্তস্রাব :—ইহার প্রতিকার-সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্ব্বে সকলের বুঝিবার জন্য দুই একটী কথা বলিতে হইতেছে। তোমরা সকলেই শুনিয়াছ যে, আমাদের শরীরের রক্ত নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভাল রক্ত হৃদ্‌পিণ্ড হইতে বাহির হইয়া সমস্ত শরীরে ঘুরিয়া শরীরের দূষিত পদার্থ লইয়া আবার হৃদ্‌পিণ্ডে উপস্থিত হইয়া দোষশূন্য হইয়া আবার শরীরের নানাস্থানে ঘুরিবার জন্য বাহির হয়। যে রক্তবহা নালী দিয়া হৃদ্‌পিণ্ড হইতে ভাল রক্ত বাহির হয় উহাকে ধমনী বলে। ধমনীতে আঘাত লাগায় যে রক্তস্রাব হয় উহা উজ্জ্বল লালবর্ণ দেখায় এবং একবার ফিন্‌কি দিয়া আর একবার মৃদুভাবে নির্গত হইয়া থাকে। ধমনীর রক্তস্রাব বন্ধ করিতে হইলে ঘায়ের উপর দিকে (অর্থাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের দিকে) চাপ দিয়া বাঁধিতে হয় এবং ঘা-মুখে ঠাণ্ডা জলপটি কিম্বা বরফ দিতে হয়। আর, ময়লা রক্ত যে নালী দিয়া আবার হৃদপিণ্ডে যায় তাহাকে শিরা বলে। শিরায় আঘাত লাগিয়া যে রক্তস্রাব হয়

উহার বর্ণ নীলাভ লাল এবং ঐ রক্ত সমান ভাবে বাহির হইতে থাকে। শিরার রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য ক্ষত স্থানের নীচে অর্থাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের বিপরীত দিকে, সামান্য চাপ দিলেই রক্ত বন্ধ হইবে। আর ধমনী হইতে যে সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নালী বাহিয়া ভাল রক্ত শিরায় শিরায় ধাবিত হয় ঐ সব নালীতে ক্ষত হইয়া যে রক্তস্রাব হয় তাহাও ঘোর লাল এবং বিন্দু বিন্দু করিয়া চোঁয়াইয়া পড়িতে থাকে। উহা বন্ধ করিবার জন্য ক্ষতের উপর চাপ দিতে হয়। হাতে কিম্বা পায়ের ধমনী কাটিয়া গেলে সেই অঙ্গ উঁচু করিয়া রাখিতে হয়। কোন প্রকার অস্ত্রের দ্বারা সামান্য আঘাত জন্য রক্তস্রাব হইতে থাকিলে একটু তার্পিণ তেল অথবা টিংষ্টীল, কুকুর শোঁকা গাছের পাতার রস অথবা দুর্ব্বার রস কি গাঁদা ফুলের পাতার রস দিলে রক্ত বন্ধ হয়। তারপর ক্ষতস্থানে টিংচার আইডিন্ সামান্য একটু তুলায় এক ফোঁটা লাগাইয়া সেই তুলাদিয়া ক্ষত স্থান মুছিয়া লইয়া ক্ষত স্থানের উপর চাপিয়া দিয়া পরিষ্কার কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রাখিলে ভাল হইবে।

২। ফুস্‌ফুস্ হইতে রক্তস্রাব হইলে সর্ব্বপ্রথমে ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাইবে। রোগীকে বেশ আরামে শোঁয়াইবে এবং তাহাকে স্থির ভাবে রাখিবে। কোন প্রকারে নড়িতে বা কথা কহিতে দিবে না। রোগীর মনে পাছে ভয় হয় এজন্য রক্ত দেখিতে দিবেনা কিম্বা কেহ যেন ভয়সূচক কথা না বলেন। রোগী যাহাতে উত্তেজিত হয় এরূপ সমস্ত বিষয় দূর করিতে হইবে। যদি বরফ পাওয়া যায় তবে বরফ, নতুবা শীতল জলের পটী বুকে লাগাইবে ও বরফের টুক্‌রা চুষিতে দিবে। উত্তেজক ঔষধ মদ্য, চা, গরম খাদ্য-পানীয় একেবারেই নিষিদ্ধ। রক্ত-বমন হইলেও ঐরূপ করিবে এবং তারপিন তেল শুঁকিতে দিবে।

৩। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব :—যদি নাক দিয়া দুইএক বিন্দু করিয়া সামান্য রক্ত পড়ে, তবে উহা বন্ধ করা ভাল নহে। আর যদি বেশী রক্ত পড়ার জন্য রোগী দুর্ব্বল বোধ করে, তবে রোগীর গলার ও কোমরের কাপড় আল্‌গা করিয়া দিবে এবং মাথা কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ দিকে হেলাইয়া দিবে যাহাতে নাসিকার অগ্রভাগ ঊর্দ্ধদিকে থাকে। মাথা হেট করিতে দিবেনা। ঘাড়ে গামছা ভিজাইয়া কিম্বা জলপটী দিবে কিম্বা বরফ লাগাবে। ভিজা সরু ন্যাকড়ার পটী নাকের নীচে চাপিয়া ধরিবে। ঠাণ্ডাজল নস্য করিয়া লইতে দিবে এবং মাথায় ঠাণ্ডা জলের ধারাণি দিবে। অথবা এক পোয়া ঠাণ্ডা জলে এক ছোট চামচ্ ফট্‌কিরি গুলিয়া সেইজল ছোট কাচের পিচ্‌কারি দিয়া নাকের মধ্যে ধীরে ধীরে দিবে অথবা সরু পাত্‌লা ন্যাক্‌ড়া ফট্‌কিরির জলে ভিজাইয়া নাকের মধ্যে পেন্‌সীল কি কলমের বাঁট দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবে; রোগীকে নাক ঝাড়িতে দিবে না। গরমজলে পা ডুবাইয়া রাখিবে। ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া বেশ বায়ু আসিতে দিবে।

৪। বোল্‌তা, ভীমরুল, বিছা প্রভৃতিতে কামড়াইলে সেই স্থানে চাপিয়া ধরিয়া (দরকার হইলে ছুরি দিয়া কাটিয়া) হুলটী উঠাইয়া ফেলিবে, তারপর এমোনিয়া, সোডা কিম্বা পটাসের জল দিয়া ক্ষতস্থান ধুইয়া ফেলিবে। তারপর একটী পেঁয়াজ কাটিয়া সেইস্থানে ঘষিবে অথবা গাঁদা ফুলের পাতার রস দিবে। বিছায় কামড়াইলে ওলের, কি কচুর আটা লাগাইলে যন্ত্রণা দূর হইবে। বিচুটী, কচু, ওল দিয়া ধুইয়া তাহার উপর সোডা ও স্পিরিট এমোনিয়া এরোমেটীক প্রলেপ লাগাইলে ভাল হয়।

শুয়াপোকা লাগিলে ডুমুর পাতার রস ঘষিয়া গরম চুণ লাগাইয়া দিবে।

৫। সর্পাঘাত :—ক্ষতস্থানের ৪ অঙ্গুলি উপরে একটী ও ৬ অঙ্গুলি অন্তর অন্তর ২।৩টী তাগা বাঁধিবে ও রক্তস্রাব বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্ষতস্থানে গরম জল ঢালিতে থাকিবে। তারপর কষ্টিক দিয়া কিম্বা লাল করিয়া তাতানো লৌহ দ্বারা পোড়াইয়া দিবে। অথবা ক্ষতস্থান গভীর করিয়া ছুরি দিয়া চিরিয়া পারমাঙ্গানেট-অব্-পটাস্ নামক ডাক্তারী ঔষধ তাহাতে পুরিয়া কিম্বা ঘষিয়া দিলে বিষ নষ্ট হয়। রোগীকে ঘুমাইতে দিবে না ও তাহার শরীর বেশ গরম রাখিবে। ডাক্তার দ্বারা "এন্টিভেনিন্" নামক ঔষধ ঠিক সময় প্রযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা।

৬। পাগলা শেয়াল কুকুরে কামড়াইলে সাপে কামড়ানো মত করিবে ও ঐ কুকুর ১০।১২ দিন নজরে রাখিয়া বুঝিতে হয় যথার্থ পাগল কি না। বেলগাছিয়া হাঁসপাতালে কুকুর পাঠাইয়া পরীক্ষা করা যায়। পাগলা শেয়াল কুকুরে কামড়াইলে রোগীকে কলিকাতার পটলডাঙ্গার হাঁসপাতালে অবিলম্বে পাঠাইবে।

৭। অগ্নিদাহ—কোন স্থান আগুনে পুড়িয়া গেলে কদাচ জল দিবে না। দগ্ধস্থানে কুক্সিমে (কুকুর শোঁকা বনমূলা) পাতার রস লাগাইবে। অথবা অল্প মসিনার তেল, অভাবে নারিকেল তেল, ও পান খাইবার চূণের উপরকার পরিষ্কার জল, একসঙ্গে ফেনাইয়া লাগাইয়া দিবে। তারপর নূতন কাপাশের তুলা, নিমপাতার জলে বেশ সিদ্ধ করিয়া নিংড়াইয়া লইয়া ক্ষত-

স্থানের উপর বিছাইয়া তারপর পরিষ্কার কাপড় দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে। ক্ষতস্থান খোলা রাখিবে না।

৮। চক্ষুতে ধূলা, বালি, কয়লার গুঁড়া, কি অন্য কিছু পড়িলে কদাচ রগড়াইতে দিবে না এবং কাপড়ের কোনা পাকাইয়া ধীরে নরমভাবে চেষ্টা করিয়া বাহির করিয়া দিবে। না পারিলে চক্ষুর সেই পাতাটী টানিয়া ধরিয়া অপর পাতাটী নীচে ঢুকাইয়া দিলে পক্ষ্ম রোমের দ্বারা সেই জিনিসটা বাহির হইয়া যাইবে। একবারে না হয়, ২।৩ বার এইরূপ করিবে। চোখে চূণ পড়িলে, ঈষৎ গরম জলে নেবুর রস দিয়া ধুইবে, তারপর ২।১ ফোঁটা রেড়ীর তেল দিয়া উপরে সামান্য আল্‌গা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে। রেলগাড়ীতে কয়লার গুঁড়া চোখে পড়িলে, অপর চক্ষু রগড়াইলে দুই চোখে জল আসিয়া ঐ গুঁড়া সেই জলের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু যে চোখে কিছু পড়িবে সে চোখ্‌ কদাচ রগড়াইতে দিবে না।

৯। কাণের মধ্যে পোকা মাকড় ঢুকিলে, কাণ সূর্য্যের দিকে রাখিলে পোকা বাহির হইয়া যায় অথবা সহ্য করার মত গরম সরিষা তেল কাণে পূরিয়া দিয়া রাখিলে পরে ঐ তেলের সঙ্গে পোকা বাহির হইয়া যায়। কোন অজ্ঞাত কারণে কাণ কাম্‌ড়াইতে থাকিলে একটী চাম্‌চেতে ১০।১২ ফোঁটা সরিষা তেলে এক সরিষা পরিমাণ আফিং (শিশু হইলে তাহার অর্দ্ধেক) গুলিয়া প্রদীপে অল্প গরম করিয়া ২।১ ফোঁটা মাত্র কাণে দিবে। শক্ত খইল জমিয়া কষ্ট পাইতে থাকিলে ২।৪ ফোঁটা গ্লিসিরিণ কাণে দিয়া তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়া পরদিন সরু সন্না দিয়া ধীরে ধীরে খইল বাহির করিয়া দিবে।

১০। নাসিকা-মধ্যে কিছু ঢুকিয়া গেলে অপর নাক আট্‌কাইয়া ধরিয়া নাক ঝাড়িবে ও নস্য দ্বারা কি কাপড়ের কোনা পাকাইয়া হাঁচিবে তাহাতে বাহির হইয়া যাইবে। নতুবা ডাক্তার সরু সন্না দিয়া বাহির করিয়া দিবেন।

১১। কণ্ঠ :—মাছের কাঁটা কি মাংসের সরু হাড় গলায় বিঁধিলে পাকা-কলা-মাখা-ভাতের-দলা গিলিলে নামিয়া যায়। ছোট শিশু পয়সা কি ঐ রকম কিছু গিলিয়া, গলায় আট্‌কাইলে প্রথমে আঙ্গুল দিয়া বাহির করার চেষ্টা করিবে। তাহাতে না হইলে শিশুর পা ধরিয়া ঝুলাইয়া, পিঠে আস্তে আস্তে আঘাত করিতে থাকিলে ঐ জিনিসটী বাহির হইয়া যায়। যদি পেরেক, আল্‌পিন কি ঐ রকম কিছু গিলিয়া ফেলে, তবে সুজীর পায়স, হালুয়া, পাঁউরুটী পেট ভরিয়া খাইতে দেবে কিম্বা পেঁজা তুলার সহিত খানিকটা গরম দুধ খাইতে দেবে তাহাতে পেটের মধ্যের সেই জিনিসটা তুলায় জড়িত হইয়া মলের সহিত বাহির হইবে। যদি বাহির না হইয়া পেটে আট্‌কাইয়া থাকে তবে ডাক্তার দেখাইতে হইবে।

১২। অজ্ঞান অবস্থা ও মূর্চ্ছা :—কাহাকেও অজ্ঞান অবস্থায় দেখিলে তক্ষণি ডাক্তার আনিতে পাঠাবে এবং রোগীর গলার ও গায়ের সমস্ত অাঁট কাপড় খুলিয়া ফেলিবে এবং রোগীকে চিৎ করিয়া শোওয়াইবে, হাত দুইটী দুই পাশে সমান ভাবে রাখিবে এবং পা সোজাভাবে ছড়াইয়া দিবে। ঘরে যথেষ্ট বায়ু আসিতে দিবে।

১৩। সন্ন্যাস রোগ :—যদি দেখ রোগী হঠাৎ কিম্বা আস্তে আস্তে অজ্ঞান হইয়া পড়িল ; মুখ লাল, নাক ডাকিতেছে, গলা ঘড়ঘড় করিতেছে, নিশ্বাস ফেলিবার সময় গাল ফুলিয়া উঠিতেছে,

চোখের মণি একটী অপরটী অপেক্ষা বড়, কোন অঙ্গ সঞ্চালনে ক্ষমতা নাই, মাংসপেশী সঙ্কুচিত হইয়াছে, তবেই জানিবে সন্ন্যাস রোগ হইয়াছে। তখন রোগীকে শোয়াইয়া সমস্ত কাপড় ঢিলা করিয়া দিবে, মাথা উঁচু করিয়া রাখিয়া বরফ অথবা ঠাণ্ডা জল দিবে এবং পায়ে গরম জল দিবে। কোন রকম বমি করার ঔষধ কি মাদক দ্রব্য দিবে না এবং যে পর্য্যন্ত রোগী কিছু গিলিতে না পারে ততক্ষণ মুখে কিছু দিবে না।

১৪। মৃগী-রোগ ঃ—রোগী হঠাৎ চীৎকার করে, মুখে ফেনা কাটে, জীভ্ কামড়ায়, ঘাড়ের ও গায়ের মাংসপেশীর আক্ষেপ হয়, মুখ লাল, ঘাড়ের শিরা ফোলা, চোখ্ লাল, প্রথমে অজ্ঞান তারপর গাঢ় নিদ্রা, আবার জাগিয়া উঠিয়া ভ্যাবা-চ্যাকা লাগা, কি হইয়াছিল কিছুই মনে নাই তবেই বুঝিবে মৃগী-রোগ। তখন গলার ও গায়ের সমস্ত আঁট্ কাপড় খুলিয়া ফেলিবে, মাথা উঁচু রাখিবে এবং যাহাতে জিভ্ কামড়াইতে না পারে এইরূপ ভাবে দুই চোয়ালের মধ্যে কাপড় পূরিয়া দিবে এবং আক্ষেপের সময় কোন অঙ্গে আঘাত না লাগে তাহা দেখিবে এবং যতক্ষণ ফিট্ থাকে ততক্ষণ ঘুমাইতে দেবে এবং কি হইয়াছিল তাহাকে কিছু বলিবে না।

১৫। হিষ্টিরিয়া :—যদি দেখ রোগীর শরীর ও মাথা নাড়িতে নাড়িতে হঠাৎ পড়িয়া গেল, চক্ষু অসাড় নহে ঠিক অজ্ঞানও নহে, কিম্বা যদি উত্তেজিত হইয়া থাকে ও গাহিতে থাকে, এদিক ওদিক হাত ছুড়িতে থাকে, বোধ হয় যেন খেঁচিতেছে, হাসিতেছে অথচ চারিদিকে কি রহিয়াছে জানিতে পারে না, তবেই বুঝিবে হিষ্টিরিয়া হইয়াছে। তখন গায়ের কাপড় আল্‌গা করিয়া দাও, শরীর ঠাণ্ডা

জলে বেশ করিয়া ধুইয়া দাও কিন্তু সে যেন না বুঝিতে পারে যে কেউ তাহার কোনরূপ শুশ্রূষা করিতেছে। এরূপ করিলে শীঘ্রই রোগীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে।

১৬। মাতাল অবস্থা—রোগীর মুখে মদের গন্ধ, অবস্থা অজ্ঞান বটে কিন্তু জাগানো যায়, চোখের মণি দুইটী সমান বড়, চক্ষু ছুঁইলে অল্প অল্প নড়ে, শরীরের উত্তাপ ৯৬।৯৭ ডিগ্রী, নাড়ী জোর, কিন্তু খিঁচুনি নাই, কান দিয়া রক্ত পড়ে না অথবা কোন আঘাতের চিহ্ন নাই; তবেই বুঝিবে মাতাল হইয়াছে। এরূপ হইলে কাপড় আল্‌গা করে দাও, ঘরে বাতাস আসিতে দাও, এবং সহজে শ্বাস প্রশ্বাস চলে রোগীকে এমন ভাবে শোয়াও এবং গায়ে কাপড় দিয়া ও গরম জলের বোতলের দ্বারা সেক দিয়া রোগীকে বেশ গরমে রাখো। যদি গিলিতে পারে ত কড়া-চা, কি কাফি খাওয়াও। যদি নাড়ী বেশ জোরে চলিতে থাকে, তবে রাইসরিষার গুঁড়া অল্প গরম জলে গুলিয়া খাওয়াইলে বমি হইয়া উঠিয়া যাবে। তখন গরম দুধ খাইতে দিও। মাতালকে লইয়া দৌড়ানো কি ঠাণ্ডা ঘরে আট্‌কানো উচিত নহে।

১৭। যদি কোন রোগীর মুখ ফ্যাকাসে, চোপ্‌সানো, চক্ষু নিস্তেজ, নাড়ী অতি মৃদু, অল্প অল্প শ্বাস বহে দেখিতে পাও, তবে অভিঘাত (শক্) বলিয়া জানিবে। প্রহার, গভীর দুঃখ, বজ্রাঘাত, অস্ত্রোপচার কিম্বা ভয় পাইয়া অবসাদ হইয়াছে বুঝিবে। রোগী শীতে কাঁপে। তখন উত্তেজক ঔষধ, পুষ্টিকর খাদ্য, গরম দুধ খাইতে দেবে এবং রোগীর শরীর গরম কাপড়ে ঢাকিবে এবং গরম জলের বোতল দিয়া সেক দেবে এবং বুকে হাঁটুতে ও পায়ের তলায় রাইসরিষার পটী দিবে।

১৮। সর্দ্দিগর্ম্মি—রোগী অনেকক্ষণ ধরিয়া নিতান্ত গরম স্থানে ছিল তাই হঠাৎ মূর্চ্ছার মত হয়, মাথা ঘোরে, নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ করে, জল তৃষ্ণা পায়; চর্ম্ম শুষ্ক ও খুব গরম, মুখ লাল ও নাড়ী দ্রুত। রোগী ক্রমে অজ্ঞান হইয়া পড়ে ও নাক ডাকিয়া নিশ্বাস বহিতে থাকে। তখন রোগীকে শীতল স্থানে লইয়া গিয়া মুখে চোখে শীতল জল দিতে থাকিবে। শরীর সমান ভাবে রাখিয়া মাথা বেশ উঁচু করিয়া রাখিবে। গলা ও বুক হইতে সমস্ত আঁটা কাপড় খুলিয়া দেবে এবং কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া মাথায় ও শিরদাঁড়ায় বরফের থলি ও ঠাণ্ডা জল দিতে থাকিবে এবং গিলিতে পারিলে ঠাণ্ডা জল খাইতে দেবে।

১৯। বিষভক্ষণ :—রোগী বিষ খাইয়াছে বুঝিতে পারিলে যদি অজ্ঞান না হইয়া থাকে তবে তাহাকে যথেষ্ট দুধ খাইতে দেবে কিম্বা ময়দা জলে গুলিয়া সরিষা তেল মিশাইয়া খাইতে দেবে তাহাতে পেটের মধ্যে বিষ চাপা পড়িয়া যায় এবং বমি হইলে ঐ বিষ শুদ্ধ উঠিয়া যায়। আবার কাঁচা ডিম ভাঙ্গিয়া, দুধ বা জলে গুলিয়া খাইতে দেবে, তাহাতেও বিষ উহাতে চাপা পড়ে যায়। অথবা ৫।৬ চামচ্ রেড়ী, নারিকেল, সরিষা, বাদাম, তিল বা মসিনার তেল খাওয়াইবে। (তবে ফস্ফরাস্ বিষে তেল দিতে নাই) যখন দেখিবে রোগীর মুখ ঠোঁট ক্ষার বা দ্রাবকে পুড়িয়া যাওয়ায় কোন চিহ্ন দেখা যায় না, তখন নীচে লিখিত বমনকারক ঔষধ দিবে। রাইসরিষার গুঁড়া মাঝারি চামচের এক চামচ, বড় গ্লাসের এক গ্লাস একটু গরম জলে মিশাইয়া খাইতে দেবে। অথবা বড় এক চামচ্ লবণ বড় গ্লাসের এক গ্লাস গরম জলে গুলিয়া খাওয়াইবে অথবা আঙ্গুল দিয়া কি পালক দিয়া গলায় সুড় সুড়ি দিয়া বমি

করাইবে। বিষ-খাওয়া-রোগীকে কিছুতেই ঘুমাইতে দেবে না। রোগীর মুখে ঠোঁটে কোন রকম চিহ্ন না দেখিলে বমনকারক ঔষধ এবং তেল দুধ খাওয়াইবে কিন্তু ফস্ফরাস্ বিষাক্ত হইলে তেল খাওয়াবে না। মুখে, ঠোঁটে কোনরূপ দাগ দেখিতে পাইলে বমনকারক ঔষধ দেবে না।

২০। আফিং বিষাক্ত ঃ—প্রথমে তন্দ্রাক্রমে গাঢ় নিদ্রাভিভূত; শ্বাস-প্রশ্বাস কম, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ, শেষে রোগীর আর নিদ্রাভঙ্গ হয় না। চোখের মণি খুব ছোট হয়, মুখ মলিন, গায়ে চট্‌চটে ঘাম, নিশ্বাসে আফিঙ্গের গন্ধ পাওয়া যায়। রোগীকে বমি করাইবে এবং কিছুতেই ঘুমাইতে দেবে না, জোর করিয়া এদিকে ওদিকে হাঁটাইয়া লইয়া বেড়াইবে। ভিজা গামছার দ্বারা তাহার মুখে বুকে ঘাড়ে অল্প জোরে আঘাত করিতে থাকিবে। এক পেয়ালা কড়া-চা কি কফি খাওয়াইবে। যখন কোন রকমে ঘুম ভাঙ্গানো যায় না তখন চটীজুতার দ্বারায় পায়ের তলায় আঘাত করিতে থাকিবে। যখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কম হইতে দেখিবে তখন “কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস” চালাইবে, যে প্রকরণ, জলে-ডোবার জন্য নীচে ক্রমে বলা যাইতেছে।

২১। জলেডোবা ঃ—জলেডোবা মানুষকে যত শীঘ্র পার ডাঙ্গায় তুলিয়া, সমস্ত কাপড় চোপড় খুলিয়া ফেলিয়া, তাহার ডান্ হাত কপালের উপর রাখিয়া, বুকের নীচে একটা ছোট বালিস দিয়া রোগীকে উপুড় করিয়া শোওয়াও। রোগী শিশু হইলে পা দুইটী উঁচু করিয়া ধরিয়া মাথা নীচু করিয়া, ১০।১৫ বার একটু জোরে জোরে ঝাঁকানি দাও ও মাঝে মাঝে বুকে পেটে ২।৪ বার

চাপ দিয়া ধর, তাহাতেই অনেক জল বাহির হইয়া যাইবে। পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তিকে এক মিনিটকাল উপুড় করিয়া রাখিয়া একটু জোরে বুকে, পিঠে, পাঁজরে তাড়াতাড়ি চাপিয়া মর্দ্দন করিতে থাকো। তারপর ডান্ কাৎ কর এবং এক মিনিটকাল পেট ও বুকের উপর চাপ দাও। পরে আবার উপুড় করিয়া আগের মত কর। এই রূপ ২।৩ বার করিলে পেটের মধ্য হইতে অনেকটা জল বাহির হইয়া পড়িবে। যদি দেখ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস সহজে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে তবে রোগীর গায়ের জল মুছিয়া শুক্‌না কম্বলে শোয়াইয়া গরম কাপড়ে গা ঢাকিয়া দাও, ও গরমজলের বোতল দিয়া কি গরম বালির-পুঁটুলি দিয়া পায়ের তলায় সেক দাও তারপর একটু সুস্থ হইলে গরম দুধ খাইতে দাও।

রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইলে রোগীকে খাটের উপর চিৎ করিয়া শোয়াইয়া কাঁধের নীচে একটা ছোট বালিস রাখিয়া মাথাটী নীচু করিয়া দাও। একজন লোক খাটের উপর বসিয়া সম্মুখ হইতে রোগীর মুখ খুলিয়া জিভ্‌টা বেশ একটু জোরে টানিয়া রাখিবে। অন্য আর একজন, রোগীর মাথার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া দুই হাত নিজের দুই পাশে এরূপ ভাবে টানিয়া ধরিবে যে, রোগীর হাত দুইটী নিজের মাথার দুই পাশে ঠেকে, তখনি আর একজন লোক, ঐ হাত দুইটী টানিয়া লইয়া রোগীর পাঁজরের পাশে চাপিয়া ধরিবে, তক্ষণি আবার উঁচু করিয়া তুলিবে তক্ষণি নীচে আনিয়া রোগীর পাঁজরে চাপিয়া ধরিবে। এইরূপ ১৫ বার কর এবং মিনিট দুই অপেক্ষা করিয়া দেখ শ্বাস চলে কিনা। নচেৎ আবার কর এইরূপ আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত করিলে যদি শ্বাস-প্রশ্বাস না চলে তবে অবস্থা শোচনীয় জানিবে। জলেডোবা চিকিৎসা জন্য পরিপক্ক ডাক্তার তখনি

সংবাদ দিয়া আনিবে। ততক্ষণ নিজেরা চেষ্টা দেখিবে। উপরে কথিত কৌশলকে "কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস" করানো বলে।

২২। উচ্চ হইতে পতন:—বেশী উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া গেলে জীবনের আশঙ্কা বিশেষরূপ আছে সুতরাং অবিলম্বে ডাক্তারকে ডাকাইতে হইবে। মস্তিষ্কের মধ্যে রক্তস্রাব, পেটের মধ্যে কি তলপেটের মধ্যে রক্তস্রাব (যাহা বাহিরে হঠাৎ বোঝা যায় না) অথবা অস্থিভগ্ন, কি স্থান-চ্যুতি যাহা পরিপক্ক ডাক্তার ভিন্ন অন্য কেহ রোগীর যথার্থ সাহায্য করিতে পারে না। তবে ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বে রোগীকে স্থিরভাবে শোয়াইয়া রাখিবে, হাত পা সহজ ভাবে লম্বা করিয়া ছড়াইয়া রাখিবে। রোগী অজ্ঞান হইলে মাথায় বরফ কি ঠাণ্ডা জল দিবে। মুখে চোখে ঠাণ্ডা জল দিতে থাকিবে। রোগীর জ্ঞান থাকিলে শীতল জল খাইতে দিবে। আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব হইলে নাড়ী ক্রমেই ক্ষীণ হইবে এবং গায়ের রং ক্রমে ফ্যাকাসে হইবে। রোগী কোন স্থানে যন্ত্রানার কথা বলিলে তথায় বরফ দেবে।

২৩। তড়্কা:—ছোট ছেলে পুলের প্রবল জ্বর হইলে কখনো কখনো মাথায় রক্তাধিক্য হওয়া হেতু চোখ খুব লাল ও বিস্ফারিত, মুখ লাল, হাত পায়ে কম্পন বা প্রবল খিঁচুনি, গায়ে মাথায় ঘর্ম্ম, এবং রোগী ভয় পাইয়া চীৎকার করিতে থাকে। তখন মুখে চোখে শীতল জলের ঝাপ্টা এবং মাথায় বরফ অথবা শীতল জলের পটী এবং পা দুইটী গরম জলে ডুবাইয়া রোগীকে বাতাস দিতে থাকিলে তড়্কা ভাঙিয়া যায়। আবশ্যক হইলে শীতল জলের ধারাণি রোগীর মাথায় করিতে হয়; তখন বালিসের

উপর অয়েল-ক্লথ কি কলারপাতা দিয়া ঢাকা দিতে হয় যেন বিছানা না ভিজিয়া যায়।

(লেখকের আত্মকথা ঃ—কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র বসু এম্-বি মহোদয়ের নিকট এই অধ্যায়ের অধিকাংশের জন্য আমি বিশেষরূপ ঋণী। তাঁহার লিখিত যে যে অংশ কিম্বা ভাবার্থ লইয়া এই পুস্তিকার এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা জানাইতেছি। অপিচ এই অধ্যায়ের কিছু অংশ কালীঘাট নিবাসী বিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বসু এম্-বি মহোদয়ের নিকট হইতে গৃহীত উপদেশ অনুসারে লিখিত হইয়াছে ; তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি)

———

বিবিধ জ্ঞানগর্ভ কবিতা ও প্রবচন।

(১)

জয়জগদীশ জয় বলরে বদন।

বিভু-গানে মাতোয়ারা, জগৎ আনন্দে ভরা,

সাজিয়াছে বসুন্ধরা পরিয়া ভূষণ ;

জয় বিশ্বরূপ জয়, অনাদি পুরুষ জয়,

জয় প্রেমময় হরি, ব্রহ্মাণ্ড-তারণ ;

জয় জগদীশ জয় বলরে বদন ॥

(হেমচন্দ্র বন্দ্যো।)

(২)

কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই ?

কি হবে সে ধনে যাতে তোমারে হারাই ?

(চণ্ডীচরণ সেন।)

(৩)

সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়।

অসময়ে হায়, হায়, কেহ কিছু নয় ॥

কেবল ঈশ্বর, সেই বিশ্বপতি যিনি।

সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি ॥ (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

(৪)

বহুরূপে সম্মুখে তোমার,

ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?

জীবে দয়া করে যেই জন ;

সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। (বিবেকানন্দ।)

(৫)

কি কারণ দীন তব মলিন বদন ?
যতন করহ লাভ হইবে রতন।
কেন পান্থ ! ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ ?
উদ্যম-বিহনে কার পূরে মনোরথ ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে ?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ?

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।)

(৬)

রসনা সুতৃপ্ত বটে মিষ্ট রসে হয়,
উদরের পীড়া কিন্তু জনমে নিশ্চয়।
আপাতঃ মধুর পাপ, কার্য্যকালে বটে,
পরিণামে পরিতাপ অবশ্যই ঘটে।

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।)

(৭)

গহন বিপিন কিম্বা পর্ব্বত কন্দরে,
ভয়াল ভল্লুক সিংহ ব্যাঘ্র বাসকরে।
ভূগর্ভে বিবর মাঝে কুণ্ডলিত ফণী ;
মেঘের আড়ালে রয় আকাশে অশনি।
অন্তরীক্ষে, স্থলে, আরো জলের ভিতর,
মকর, কুম্ভীর, নক্র থাকে জলচর।
এরা শত্রু বটে কিন্তু মনের ভিতরে,
ঘোর শত্রু ষড়-রিপু সদা বাস করে।

(যদু গোপাল চট্টো।)

(৮)

রিপু যার বলবান, সন্ন্যাসে কি ফল তার ?
যোগীর যোগিত্ব নহে রক্ত-বস্ত্র-জটা-ভার।
কামনা যে নাহি পারে করিবারে বিসর্জ্জন,
কামনা বাড়িবে তার যত সে হবে নির্জ্জন।

(অজ্ঞাত।)

(৯)

ব্রত পূজা বৃথা সব, একাগ্রতা নাহি যার।
সাধনা যে নাহি জানে, কিসে হবে সিদ্ধি তার ?
শিলা-ভাবে শিলা-পূজা যে করিবে হতাদরে ;
শিলারূপী নারায়ণ সে পাবে কেমন করে ?

(অজ্ঞাত।)

(১০)

জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাস প্রীতি, প্রেম, ভালবাসা,
প্রাণে প্রাণে আছে যার, পূরে তার মনোআশা।
নিবৃত্তির পথে যার, মন-প্রাণ ধাবমান,
সে মহাপুরুষ যোগী, সেই পায় ভগবান্।

(অজ্ঞাত।)

(১১)

প্রবৃত্তির দাস যারা শৃঙ্খলিত তারা দীন।
নিবৃত্তি যাদের মন্ত্র তারা মুক্ত কর্ম্মহীন ॥

(অজ্ঞাত।)

(১২)

পুতুল বাজির পুতুল মোরা, যেমন নাচায় তেমনি নাচি।
যখন মরায় তখন মরি, যখন বাঁচায় তখন বাঁচি ॥
নাচি গাই তার তালে মানে, ভাল মন্দ সেই জানে।
তার যা ভাল লাগে প্রাণে, সেই ভাল ;—নেই বাছাবাছি ॥

(অজ্ঞাত।)

(১৩)

তোমারি করুণায় দেব! সকলি হইতে পারে ;
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত-সম বাধা-বিঘ্ন যায় দূরে ॥
তুমি মঙ্গল-নিধান,
করিছ মঙ্গল বিধান,
তবে কেন বৃথা মরি, ফলাফল চিন্তাকরে ?

(ব্রহ্ম সঙ্গীত।)

(১৪)

বাকি কি রেখেছ দিতে ও করুণা-আধার ?
খুলিয়া দিয়াছ নাথ! সুধার ভাণ্ডার।
দিলে দেহ, দিলে মন,
দিলে আত্মজ্ঞান ধন,
দিলেহে প্রেম-ভূষণ, সকল রতন-সার।
চির সুখ সাধিবারে,
দিলে নাথ আপনারে,
কে আছে হে, এসংসারে তোমাসম দাতা আর ?

(ব্রহ্ম সঙ্গীত।)

(১৫)

অসীম সাগর তুমি, আমি ক্ষুদ্র নদী,
স্নেহময় বক্ষে তব বহি নিরবধি।
বিশাল পাদপ তুমি, আমি ক্ষুদ্র লতা,
জড়ায়ে তোমার অঙ্গে ভুলি সব ব্যথা।
তেজোময় তুমি রবি, আমি ক্ষীণ তারা,
তোমার টানেতে ঘুরি হয়ে আত্মহারা।
অনন্তের মূর্ত্তি তুমি, আমি তার ছায়া ;
তোমা ছাড়া আমি নই, তোমারি এ মায়া।

(অজ্ঞাত।)

(১৬)

না মাগি সুন্দর কায় অর্থে মন নাহি ধায়,
ভোগ-সুখে চিত রত নহে।
ঈশ্বর এ বর দিন, সুস্থ থাকি চিরদিন,
যেন মোর ধর্ম্মে মতি রহে ॥
ব্যাধিহীন কলেবর, শুদ্ধ-মতি নিরন্তর,
হ'লে আর অভাব কি আছে ?
সুখেতে সময় যাবে, ধনী কি এসুখ পাবে ?
—চিন্তা ভয় সদা যার কাছে ॥

(যদু গোপাল চট্টো।)

(১৭)

ভাল মন্দ দোষগুণ আধারেতে ধরে,
ভুজঙ্গ অমৃত খেয়ে গরল উগরে।

লবণ-জলধি-জল করিয়া ভক্ষণ,
জলধর করিতেছে সুধা বরিষণ।
সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া,
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া। (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।)

(১৮)

বাক্য-ভারে ভারাক্রান্ত, অবসন্ন হয়ে গেছে প্রাণ,
কর্ম্মক্ষেত্রে শক্তি-স্ফূর্ত্তি, অন্তর্য্যামী কর মোরে দান।
অকপটে তব পদে এই ভিক্ষা চাহি পরমেশ!
সত্য সত্য বুঝি যেন, জননী-রূপিণী আমার স্বদেশ।

(যোগীন্দ্রনাথ বসু)।

(১৯)

যে জন দিবসে, মনের হরষে,
জ্বালায় মোমের বাতি ;
আশু গৃহে তার, দেখিবেনা আর,
নিশিতে প্রদীপ ভাতি।

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)।

(২০)

মহামূল্য পরিচ্ছদ রতন ভূষণ,
নরের মহত্ত্ব নারে করিতে বর্দ্ধন।
সামান্য বসন মাত্র করি পরিধান,
সভামধ্যে বিদ্যাবান্ লভে বহুমান।
জ্ঞান-পরিচ্ছদ আর ধর্ম্ম-অলঙ্কার,
করে মাত্র মনুষ্যের মহত্ব বিস্তার।

(হরিশ্চন্দ্র মিত্র)।

(২১)

এখনি সৃজন করি এখনি সংহার,
তোমার অনন্ত-লীলা বুঝে সাধ্যকার?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর,
প্রণাম তোমারে প্রভো! প্রণাম আমার।

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)।

(২২)

নিয়ত মানস-ধামে একরূপ ভাব,
জগতের সুখে দুঃখে সুখ-দুঃখ-লাভ।
পর-পীড়া-পরিহরি পূর্ণ-পরিতোষ,
সদানন্দে পরিপূর্ণ স্বভাবের কোষ।
নাহি চাহে আপনার পরিবার-সুখ,
রাজ্যের কুশল কার্য্যে সদা হাস্য-মুখ।
কোন-মতে পরহিতে শ্রেয়ঃ লাভ যার,
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর?

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)।

(২৩)

কাজ যদি ইচ্ছা কর তবে কর ভাই।
মিছামিছি মুখে ব'লে কোন ফল নাই॥
শরতের মিছা-মেঘ ডাক্-ডোক্ সার।
ছিঁটা-ফোঁটা নাহি তায় জলের সঞ্চার॥

(ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত)।

(২৪)

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়?
কোটি-কল্প দাস থাকা নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ-সুখ তায়।
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার,
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার।

(রঙ্গলাল বন্দ্যো)।

(২৫)

ধন্য ধন্য, জন্মভূমি আনন্দ-ভবন।
নয় নয় তুল্য তার নন্দন-কানন॥
"স্বর্গ, স্বর্গ," করে লোকে সার তার নাম।
প্রকৃত স্বর্গের সার জনমের ধাম॥
স্বদেশের উপকারে নাহি যার মন;
কে বলে মানব তারে?—পশু সেইজন।

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)।

(২৬)

যখন যে রোগে মনঃদেহ অধিকার
করে, কর যতন তখনি নাশে তার।
নতুবা সে রোগ শেষে নিশ্চয় জানিবে;
নিবারণ করা অতি কঠিন হইবে।
অঙ্কুরের উন্মূলন সহজ যেমন,
নয় নয় বদ্ধমূল বৃক্ষের তেমন।

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)।

(২৭)

কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষাহারে,
দ্যুতিমান্ মধ্যমণি যেমন সুন্দর,
সেইরূপ সমুদায় মেদিনী-মাঝারে,
আছে দিব্যস্থান এক অতি মনোহর।
ধন্য সে ধরণীতলে অগ্রগণ্য ধাম,
যাহার মাহাত্ম্য আমি অক্ষম বর্ণনে,
"স্বর্গাদপি গরীয়সী" সে ভূমির নাম,
উজ্জ্বল করিতে সাধ করে সর্ব্বজনে।

(যদুগোপাল চট্টো)।

(২৮)

পুণ্যপাপে দুঃখে-শোকে পতনে উত্থানে,
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।
হে স্নেহার্ত্ত বঙ্গভূমি! তব গৃহ-ক্রোড়ে,
চিরশিশু ক'রে আর রাখিও না ধরে।
দেশ-দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান,
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

(২৯)

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র অশোকমন্ত্র তব,
দাও আমাদের অমৃত মন্ত্র, দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,

মুক্ত, দীপ্ত, সে মহা-জীবনে চিত্ত ভরিয়া লব,
মৃত্যু-তরণ, শঙ্কাহরণ, দাও সে মন্ত্র তব ॥

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(৩০)

ব্রহ্ম-চারিণী ভারত-রমণী মুক্ত লালসা-বন্ধনা।
গহন-মগ্ন-মন্দিরে তব, আজো গাহি গুণ-বন্দনা ॥
পতি সহ তোমার চিতায় বহিয়া ধন্য দেবতা বহ্নি যে,
তোমার শুদ্ধি পরখ্ করিতে আরো বিশুদ্ধ হন নিজে।
জিনেছ শমনে, মকর-কেতনে, অয়ি জয়শ্রী-খণ্ডিতা !
প্রকৃতি-পালনে, শাসনে, ব্যসনে, রণে, রাজনীতি পণ্ডিতা ॥
ভবন-কমলা, নবনী-কোমলা, পুণ্য-বিমলা, অন্নদা,
শৌর্য্য-পালিনী, ধৈর্য্য-শালিনী, বসুধার মত রত্নধা।
ভারত-রমণী জয়মা মূর্ত্তা, হরিকীর্ত্তন-মূর্চ্ছনা।
তোমার কীর্ত্তি-সূক্ত গাহিয়া ভক্তিতে করি অর্চ্চনা ॥

(কালিদাস রায়)।

(৩১)

চির সুখী জন ভ্রমে কি কথন
ব্যথিত-বেদনা বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)।

(৩২)

পরের কারণে স্বার্থ বলি দিয়া
এ জীবন মন সকলি দাও।

তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
কার্য্য-ক্ষেত্র অই প্রশস্ত পড়িয়া
সমর-অঙ্গন সংসার এই।
যাও বীর বেশে, কর গিয়া রণ,
যে জিনিবে সুখ লভিবে সেই ॥

(কামিনী রায়)।

(৩৩)

হে ভারত ! নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র-বেশ ; শিখায়েছ বীরে
ধর্ম্ম-যুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে।
ভুলি জয়-পরাজয়, শর-সংহরিতে,
কর্ম্মীরে শিখালে তুমি যোগ-যুক্ত-চিতে
সর্ব্ব-ফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

(৩৪)

রথ-যাত্রা লোকারণ্য মহা-ধুম-ধাম,
ভক্তেরা লোটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি
মূর্ত্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্য্যামী ॥

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

(৩৫)

নদী কভু পান নাহি করে নিজ-জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল ;
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ-পান,
কাষ্ঠ দগ্ধ হ'য়ে করে পরে অন্ন-দান।
স্বর্ণ, করে নিজ রূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজ-স্বরে অপরে মোহিত ;
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,
সাধুর, ঐশ্বর্য্য শুধু পরহিত-তরে।

(রজনীকান্ত সেন)।

(৩৬)

বসুমতি ! কেন তুমি এতই কৃপণা ?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্য-কণা।
বিনা-চাষে শস্য দিলে কি তাহাতে ক্ষতি ?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন্ বসুমতী :—
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে;
তোমার গৌরব তাহে একেবারেই ছাড়ে।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

(৩৭)

যে দেশে লইয়া জন্ম, প্রিয়-পরিজন—
সহ সুখে নিবসতি করে অনুক্ষণ ;
যে দেশের বিপদেতে হইবেক ক্ষতি,
ঘটিবে মঙ্গল যার হইলে উন্নতি।

সমস্ত পৃথিবী-মাঝে মনোহর ঠাঁই ;
এমন স্বদেশ-প্রতি প্রীতি যার নাই,
হউক প্রাধান্য তার ব্যাপ্ত-বিশ্বময়,
সে জন আমার বন্ধু কখনো ত নয়।

(যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়)।

(৩৮)

নাহি চায় রাজপদ, নাহি চায় ধন,
স্বর্গের সমান দেখে স্বদেশ-ভবন।
পৃথিবীর সকলেই নিজ পরিজন,
সন্তোষের সিংহাসনে বাস করে মন,
সকলি সমান মিত্র, শত্রু নাহি যার,
মানুষ তাহারে বলি, মানুষ কে আর ?

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)।

(৩৯)

মহাবীর শিখ্ এক পথ বহি যায়,
পথ-পার্শ্বে কুষ্ঠ-রোগী পড়িয়া ধরায় ;
বেদনায় হতভাগ্য করিছে চীৎকার,
ক্ষতস্থান বহি তার পড়ে রক্তধার।
দেখিয়া বীরের মনে দয়া উপজিল,
শিরস্ত্রাণ খুলি তার ক্ষত বেঁধে দিল।
শিরস্ত্রাণ কহে,—"মাথে ছিলাম নগণ্য,
কুষ্ঠীর-চরণে প'ড়ে, হইলাম ধন্য।"

(রজনীকান্ত সেন)।

(৪০)

যেরূপ করিবে কাজ কার্য্যেতে দেখাও,
বৃথা গর্ব্বে কেন তাহা কহিয়া বেড়াও ?
না পার করিতে যদি, কর যাহা গান,
কোথায় পাইবে লজ্জা রাখিবার স্থান ?

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)।

(৪১)

স্বদেশ আমার! নাহি করি দরশন,
তোমা-সম রম্য-ভূমি নয়ন-রঞ্জন।
তোমার হরিত ক্ষেত্র,
আনন্দে ভাসায় নেত্র,
তটিনীর মধুরিমা তোষে প্রাণ মন।
যথায় যাইব আমি,
তোমায়, জনম-ভূমি!
ভুলিব না, ভুলিব না, জীবনে কখন।

(দ্বিজেন্দ্র লাল রায়)।

(৪২)

সুকোমল অঙ্কে নিয়া,
অঙ্গে কর বুলাইয়া,
পিয়াইয়া পুনঃ হৃদি-পীযুষ-ধারায়,
মমতায় বিমোহিয়া,
স্নেহবাক্যে ভুলাইয়া
হে জননি! কর পুনঃ বালক আমায়।

(সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার)।

(৪৩)

হের এই বঙ্গভূমি। হিমাদ্রি আপনি
মুকুট আকারে তাহে শোভে শিরোদেশে।
ধৌত করি পদ-তল বহেন জলধি।
নিত্য প্রক্ষালিত পূত ভাগীরথী জলে
সুজলা, সুফলা, শ্যামা ভূষারূপে তার।
হের পুনঃ আর বার নিম্ন দেশে তার,
সাগর-সঙ্গমে অই, পতিত-পাবনী
তরিতে সগর-বংশ অবতীর্ণ যথা,
মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে, পবিত্র এদেশ।

(যোগীন্দ্র নাথ বসু।)

(৪৪)

কর, কর, কর, সবে জ্ঞান-অধিকার,
জ্ঞান,—দিবাকর সম অজ্ঞান-আঁধার।
কর সবে একমনে জ্ঞানানুশীলন,
জ্ঞান লভি কর নিজ কর্ত্তব্য সাধন।

(কেদার নাথ ভারতী)।

(৪৫)

অধীনতা-পাশে বাঁধা যাহার চরণ,
কে আর অসুখী বল, তাহার মতন ?
থাক্ থাক্ গৃহপূর্ণ বিবিধ রতনে,
অধীন যে জন তার, সুখ কোথা মনে ?

স্বাধীনের ক্ষুদ্র জীর্ণ-কুটীর ভিতরে,
যেইরূপ নিরমল আনন্দ বিহরে ;
অধীনের মনোহর সুচারু আলয়,
তেমন আনন্দময় নয় নয় নয়। (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)।

(৪৬)

অখিল সংসার, রচনা যাঁহার, সে জন কি গুণ ধরে।
নিয়মে সৃজন, নিয়মে পালন, নিয়মে নিধন করে ॥
এ ভব বিষয়, সব শিবময়, শিবের সাগর ভব।
শুন ওহে জীব ! ভোগকর শিব, অশিব কি আছে তব ?
কভু হয় সুখ, কভু হয় দুঃখ, জগতের এই রীতি।
যখন যেমন, তখন তেমন, প্রভুপ্রতি রেখো প্রীতি ॥
এই ধরাতলে, নিজকর্ম্মফলে, সকলে করিছে ভোগ।
স্বকর্ম্ম ভুলিয়া ঈশ্বরে দূষিয়া মিছা কর অভিযোগ ॥

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)।

(৪৭)

দিন যায়, ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির।
সহায়, সম্পদ, বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন শৈবালের নীর।
সংসার-সমরাঙ্গনে, যুদ্ধ কর দৃঢ়-পণে,
মহিমাই জগতে দুর্লভ।
মনোহর মূর্ত্তি হেরে, ওহে জীব অন্ধকারে,
ভবিষ্যতে করোনা নির্ভর।

(হেমচন্দ্র বন্দ্যো)।

(৪৮)

মহা-হিম-ময় হয় যদি স্থান,
দারুণ উত্তাপে জ্বলে যায় প্রাণ,
তবুও সে দেশ স্বদেশ যার।
তাহার নয়নে তেমন সুন্দর
মনোহর স্থান পৃথিবী-ভিতর,
নাহিক ভূতলে কোথাও আর।
তুমি বঙ্গ-মাতা এত দীন-হীনা
এত যে মলিনা, এত হীন-প্রাণা,
তোমারো সন্তান স্বদেশে ফিরে ;
হেরে তব মুখ, মনে ভাবে সুখ,
প্রাণের আবেগে হইয়া সোৎসুক,
নিজ জন্মদেশ আনন্দে হেরে

(হেমচন্দ্র বন্দ্যো)।

(৪৯)

আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি ?
কলঙ্ক লিখিতে কাঁদিছে লেখনি,
তরঙ্গে তরঙ্গে নত, পদ্ম-মৃণালের মত,
পড়িয়া পরের পায় লুটায় ধরণী।
জগতের চক্ষু ছিল, কত রশ্মি ছড়াইল,
সে দেশ নিবিড় আজ, আঁধার রজনী ;
পূর্ণগ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি।

বুদ্ধি-বীর্য্য-বাহুবলে, সুধন্য জগতী-তলে,
ছিল যারা আজ তারা অসার তেমনি।
আজ এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি?

(হেমচন্দ্র বন্দ্যো)।

(৫০)

মানব-জীবন-সার
কিবা ভোগ আছে আর
স্বর্গ-ভোগ কাছে?
কি আছে তেমন কর্ম্ম,
দীন-সেবা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম,
পুণ্য আগে পাছে।
সাবিত্রী সমান সতী,
বসুমতী সম ধৃতি,
নাহিক কোথায়।
সন্তোষ-সাধন-সুখ
নিস্পৃহের হাস্য-মুখ
দুর্লভ ধরায়।
শ্রেষ্ঠ নহে তার সনে,
কেহ এই ত্রিভুবনে,
বিশ্বাসী যে জন।
নাহি কিছু সত্য সম,
সার বস্তু অনুপম,
ত্রিলোক-তারণ।

(রাজকুমার কাব্যস্মৃতি)।

কতিপয় প্রচলিত জ্ঞানগর্ভ প্রবচন।

(৫১)

ভক্তি বিশ্বাস দুটী ধন, রাখ্‌বে প্রাণে অনুক্ষণ।

(৫২)

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, গিন্নীর পাপে গৃহ নষ্ট।

(৫৩)

ভক্তিদ্বারা ভগবানের কাছে যাওয়া যায় ; আর
প্রেমের দ্বারা ভগবান্ নিজে আসেন।

(৫৪)

মানুষে কাজ দেখে, কিন্তু ভগবান্ অভিপ্রায় দেখেন।

(৫৫)

রিপুর বেগ যে সহ্য করে, কোন ব্যাটা তার আয়ু হরে ?

(৫৬)

যখন যার কপাল বাঁকে, দুর্ব্বাবনে বাঘ ডাকে।

(৫৭)

পাপ কল্লে পাপীর ভয়, সাধু লোকের কিসের ভয় ?

(৫৮)

পরের মন্দ কর্ত্তে গেলে, নিজের মন্দ আগে হয়।

(৫৯)

নিজের বেলায় আঁটি সাঁটি, পরের বেলায় দাঁত কপাটি।

(৬০)

শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াও তাই সয়।

(৬১)

মার মায়াই মায়া, বটের ছায়াই ছায়া।

(৬২)

যে সয় সেই রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।

(৬৩)

ক্ষুদ্ কুঁড়ো যে না বাছে, তার কপালে অন্ন আছে।

(৬৪)

মরণের কথা চরণে বলে।

(৬৫)

কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কখনো নয়।

(৬৬)

পরের দেখে তোলো হাঁই, যা আছে তাও থাক্‌বে নাই।

(৬৭)

কুমীরের সঙ্গে ক'রে আড়ি, জলে বাঁধ্‌বে ঘর বাড়ী?

(৬৮)

গোয়ালে গরু না বয় হাল, তার দুঃখ চিরকাল।

(৬৯)

যার বিয়ে তার মনে নাই, পাড়ার লোকের কাট্‌না কামাই।

(৭০)

নদীরকূলে চাষবাস, তার ভাবনা বারমাস।

(৭১)

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, এ দিন সকলের আসে।

(৭২)

অতি বড় হবেনা ঝড়ে পড়ে যাবে,অতি ছোট হবেনা ছাগলে মুড়াবে।

(৭৩)

ধার করলে হবে ঋণ, উপোশ কর্ত্তে যাবে দিন।

(৭৪)

পর নিন্দায় নরকে বাস, যুগে যুগে সর্ব্বনাশ।

(৭৫)

সৎ-সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ।

(৭৬)

অতি বড় সুন্দরী না পান বর, অতি বড় ঘরণী না পান ঘর।

(৭৭)

কালো কাপড় রুক্ষু মাথা, দুঃখু বলেন আর যাবো কোথা ?

(৭৮)

রাণী ঝী চোষে আর কাণা পুতে পোষে।

(৭৯)

যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর।
হায় বিধাতা এম্‌নি পোড়া কপাল মোর॥

(৮০)

মা হওয়া কি মুখের কথা ?
যে মা জানেনা সন্তানের ব্যাথা,
ক্ষুধার সময় সুধালে না,
এলো পুত্র গেল কোথা ?

(৮১)

পড়াস্ না পড়াস্ পো, সমাজে নিয়ে থো।

(৮২)

নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।

(৮৩)

নেই চাল্, নেই ডাল্, গিন্নী বিনে আল্ থাল্।

(৮৪)

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা কেউ বোঝে না।

(৮৫)

দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাই লাজ।

(৮৬)

ক্ষমার বড় গুণ নাই, দানের বড় পুণ্য নাই।

(৮৭)

কুচিন্তা যার নিশিদিন, শরীর তার হয় ক্ষীণ।

(৮৮)

তলোয়ারে রাজ্য জয়, স্নেহেতে হৃদয় জয়।

(৮৯)

দুঃখের কথা যত চিন্তা কর্‌বে।
দুঃখ ততই ভারী হতে থাক্‌বে।

(৯০)

অনেক খেতে করে আশা, তার নাম বুদ্ধি-নাশা।

(৯১)

থাকো সয়ে, পাবে রয়ে, দিন নয় যে যাবে বোয়ে।

(৯২)

ছেলে মারো কাপড় ছেঁড়ো আপনার ক্ষতি আপনি কর।

(৯৩)

লোভে পাপ. পাপে মৃত্যু জানিবে নিশ্চয়।
লোভে পড়ে মানুষের সব নষ্ট হয়॥

(৯৪)

মা, খায় ধান ভেনে, ছেলে খায় এলাচ্ কিনে।

(৯৫)

যার কপালে আছে দুঃখ, ফাটালে মাথা হয় না সুখ।

(৯৬)

যদি কন্যা সু-পাত্রে পড়ে, শত পুত্রের কাজ করে।

(৯৭)

আপন ধন পরকে দিয়ে, দৈবজ্ঞ বেড়ান হাবাতে হয়ে॥

(৯৮)

চক্ষু মানবের পরম মিত্র, আবার শ্রেষ্ঠ শত্রু।

(৯৯)

মিছা কথা সেঁচা জল কতক্ষণ রয়?

(১০০)

রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?

* * * *

বর্ত্তমান কালের কুমারীগণ, যাঁহারা অচিরকাল মধ্যে পরিণীতা হইয়া সুগৃহিণীরূপে স্বামী-গৃহ উজ্জ্বল করিবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন, তাঁহাদের জন্য, প্রগাঢ়-রাজনীতি-তথা-গার্হস্থ্য-নীতি-বিশারদ চাণক্য পণ্ডিত-প্রদত্ত বহু জ্ঞান-গর্ভ উপদেশের মধ্য হইতে মাত্র দ্বাদশটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করা গেল। অপিচ যাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে গৃহিণী-পদবাচ্যা হইয়াও ভাগ্যক্রমে নিজ সংসারের সুখশান্তি আনিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষমা হইয়াছেন, তাঁহারাও এই মূল্যবান্ উপদেশগুলি অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকিলে, অচিরকাল মধ্যে নিজ সংসারের নষ্ট

সুখশান্তি উদ্ধার করত, সুগৃহিণীর গৌরব লাভে সমর্থা হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই।

(১)

সা ভার্য্যা যা শুচিদক্ষা, সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা, সা ভার্য্যা যা প্রিয়ংবদা॥

অর্থাৎ

সুভার্য্যা হইতে হইলে কি কি গুণ থাকার দরকার তাহাই চাণক্য পণ্ডিত বলিতেছেন :—তিনি পবিত্রদেহ ও নির্ম্মল নিষ্পাপ-মনা হইবেন, তিনি গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা হইবেন, তিনি নিজ স্বামীকে নিজ প্রাণের ন্যায় ভালবাসিবেন, তিনি সন্তান প্রসব করিয়া নিজ গৃহ স্বর্গীয় আনন্দ-পূর্ণ করিবেন এবং তিনি সুমধুর বাক্য প্রয়োগে স্বামীর ও পরিবারস্থ সকলেরই মনে সন্তোষ প্রদান করিবেন।

(২)

মূর্খঃ যত্র ন পূজ্যতে, ধান্যং যত্র সুসঞ্চিতম্।
দম্পত্যোঃ কলহো নাস্তি তত্র শ্রীঃস্বয়মাগতা॥

অর্থাৎ

কোন্ গৃহে লক্ষ্মীদেবী নিজে আসিয়া অবস্থান করিয়া থাকেন, তাহাই চাণক্য পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিতেছেন :—যে গৃহে মূর্খ অবিবেচক লোক আদর পায় না অর্থাৎ যে বাটীতে জ্ঞানী লোকের পরামর্শ অনুসারে কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, যেখানে সম্বৎসরের আহারীয় দ্রব্যজাত ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকা হেতু দুর্মূল্য কি দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করার কিছুমাত্র হেতু থাকে না, এবং যেখানে কর্ত্তা-গিন্নীর মতভেদ-জনিত কলহের কারণ কথনই হয় না অর্থাৎ যে গৃহে

স্বামী স্ত্রী একমন, একপ্রাণ সেই গৃহই লক্ষ্মীদেবী নিজ অবস্থান-যোগ্য বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন।

(৩)

অস্তি পুত্রো বশে যস্য ভৃত্যো ভার্য্যা তথৈবচ।
অভাবে সতি সন্তোষঃ স্বর্গস্থোঽসৌ মহীতলে॥

অর্থাৎ

এই পৃথিবীতে বাস করিয়াও স্বর্গ-সুখ ভোগ করিয়া থাকেন কে? ইহার উত্তরে চাণক্য পণ্ডিত বলিতেছেন:—যাঁহার স্ত্রী-পুত্র-ভৃত্য সকলেই একান্ত বশীভূত ও আজ্ঞানুবর্ত্তী অর্থাৎ তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ করে না, যিনি কোন জিনিষের অভাবগ্রস্ত হইলেও দুঃখে ম্রিয়মাণ না হইয়া সদা সন্তুষ্টচিত্ত ও প্রফুল্ল থাকেন, সেই গৃহস্বামীই সর্ব্বদা স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছেন বলা যাইতে পারে।

(৪)

দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ

সাপের সহিত একঘরে বাস করিলে যেমন মৃত্যু নিশ্চিত, সেইরূপ আর কাহার ভাগ্যে সর্ব্বদা মৃত্যুভয় আছে? ইহার উত্তরে চাণক্য পণ্ডিত বলিতেছেন:—যে গৃহস্বামীর স্ত্রী, শারীর, মানস ও বাচিক নানা প্রকার দোষযুক্তা, যাহার বন্ধুবর্গ, খল, কপট ও স্বার্থপর, যাহার চাকরেরা অবাধ্য ও মুখেমুখে প্রতিবাদ করে, সেই হতভাগ্য গৃহস্থের ভাগ্যে অচিরকাল মধ্যে নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

(৫)

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি, ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্॥

অর্থাৎ

সদা তৃপ্তিদায়িনী স্নেহময়ী মাতা যাহার দুর্ভাগ্যক্রমে স্বর্গগতা হইয়াছেন এবং যাহার দুর্মুখা স্ত্রীর কর্কশ বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা প্রাণে অসন্তোষের আগুন জ্বলিতে থাকে, সেই হতভাগ্য গৃহস্থের পক্ষে সংসার-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, বনে বাস করাই অশেষ সুখকর, কারণ বনে হিংস্র শ্বাপদের ভয়ে রাত্রে জাগরিত থাকিতে হয় মাত্র, কিন্তু গৃহে রাত্র-দিবা, আহার-বিহার বিশ্রাম-শয়ন কোন কার্য্যেই শান্তি নাই। সেই রূঢ়ভাষিণী স্ত্রীর কৃপায় সেই গৃহে নিয়ত ঘোর অশান্তি বিরাজ করিতে থাকায়, পুরুষটীর পক্ষে শঙ্কিত-চিত্তে বাহিরে বাহিরে থাকিয়াই কালযাপন করার চেয়ে রীতিমত ভাবে সন্ন্যাসী হইয়া বনে বাস করাই কর্ত্তব্য।

(৬)

তে পুত্রা যে পিতুর্ভক্তা, স পিতা যস্তু পোষকঃ।
তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ সা ভার্য্যাযত্র নিবৃতিঃ॥

অর্থাৎ

তাহারাই যথার্থ পুত্র যাহাদের দৃঢ়াভক্তিপিতৃপদে সর্ব্বদাই বিরাজ করে, তাঁহাকেই যথার্থ পিতা বলা যায় যিনি সন্তান-গণকে উপযুক্তভাবে লালনপালন করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই যথার্থ মিত্র বলা যায় যাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া অন্তরের গুপ্ত কথা সমুদায়, তথা অর্থ-বিত্ত নির্ভয়ে ন্যস্ত করা যায় এবং সর্ব্বশেষে তাঁহাকেই প্রকৃত ভার্য্যা বলা যায় যিনি স্বামীর শোক-তাপ-জ্বালা-যন্ত্রনা-উদ্বেগ-অশান্তি নষ্ট করিয়া স্বামীকে সদা প্রফুল্লচিত্ত করিতে পারেন।

(৭)

জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান্ বান্ধবান্ ব্যসনাগমে।
মিত্রং চাপদিকালে চ, ভার্য্যাঞ্চ বিভবক্ষয়ে॥

অর্থাৎ

কোন কাজ করিতে পাঠাইলে ভৃত্য কি ভাবে সেই কার্য্য সম্পন্ন করে তাহা দেখিয়া ভৃত্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করিবে, আর তোমার সুসময়ে তোমার আত্মীয় স্বজনেরা যাহারা তোমার একান্ত হিতৈষী বান্ধব বলিয়া তোমার নিকট হইতে অশেষ উপকার পাইবার দাবী করিয়া থাকেন, তাহাদের, তোমার প্রতি ভালবাসা মৌখিক কি আন্তরিক তাহার পরীক্ষা তোমার বিপদ কালে তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া করিবে, সেইরূপ কে প্রকৃত মিত্র, আর কেই বা কপট মিত্র, তাহাও নিজের বিপদ কালে পরীক্ষা করিবে, এবং ভার্য্যাকে পরীক্ষা করিবে, যখন নিজের অর্থ-বিত্ত নষ্ট হইয়া দরিদ্র অবস্থায় পতিত হইবে। সীতা, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, চিন্তা শৈব্যা প্রভৃতি নিজ নিজ স্বামীর সহিত বনবাস ক্লেশ আনন্দে স্বীকার, করিয়া উক্তরূপ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিতে হয়।

(৮)

সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যং; নিত্যং সুখমরোগিণঃ।
ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ প্রিয়া যস্য, তস্য নিত্যোৎসবং গৃহম্॥

অর্থাৎ

কৃষকেরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন করত অগ্রে নিজের সম্বৎসরের উপযোগী শস্য ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখিয়া অবশিষ্ট বিক্রয় করিয়া থাকে সুতরাং তাহাদের গৃহে কখনই অন্নের অস্বচ্ছলতা

হয় না, সুতরাং নিত্যই উৎসবের আনন্দ বিরাজমান। আর স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তির মনে যেমন চির আনন্দ, সেইরূপ গুণবতী, সতী ও স্বামী-সোহাগিণী স্ত্রী-লাভ যাঁহার অপার সৌভাগ্য-হেতু ঘটিয়াছে, তাঁহার গৃহেও চির আনন্দ ও নিত্য উৎসব বর্ত্তমান বলা যায়।

(৯)

পরুষাণ্যপি যা প্রোক্তা, দৃষ্টা চক্রোধচক্ষুষা।
সুপ্রসন্নমুখী ভর্ত্তুঃ সানারী ধর্ম্মভাগিনী॥

অর্থাৎ

কোন্ নারী পতির ধর্ম্মভাগিণী ? এই প্রশ্নের উত্তরে চাণক্য পণ্ডিত বলিতেছেন :—স্বামী কোপন-স্বভাব হেতু স্ত্রীকে নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া থাকিলেও কিম্বা আরক্ত-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেও স্ত্রী, নিজের অবিচলিত ভালবাসা-পরিচালিত হইয়া উক্তরূপ ক্ষোভজনক আচরণ উপেক্ষা করতঃ পতির প্রতি পূর্ব্ববৎ প্রসন্নবদনা থাকেন সেই স্ত্রীই পতির যথার্থ ধর্ম্মভাগিণী হইতে পারেন।

(১০)

যস্য ভার্য্যা গুণজ্ঞা চ ভর্ত্তারমনুগামিনী।
অল্পাল্পেন তুসন্তুষ্টা, সা প্রিয়া ন প্রিয়া প্রিয়া॥

অর্থাৎ।

যে স্ত্রী পতির গুণসমূহের সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া থাকেন, যে স্ত্রী যথার্থ সহধর্ম্মিণী হইয়া পতি-প্রদর্শিত পথে থাকিয়া পতির কার্য্য সমুদায় করিয়া থাকেন, যে স্ত্রী অল্পমাত্র যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়েন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তিনিই পতির ভালবাসার পাত্রী, নতুবা কেবল "প্রিয়া" বলিলেই প্রকৃত ভালবাসার পাত্রী হওয়া যায় না।

(১১)

যস্য ভার্য্যাশ্রিতান্যত্র কশ্মলা কলহপ্রিয়া।
কুক্রিয়া ত্যক্তলজ্জাচ সাজরা ন জরা জরা।

অর্থাৎ

কোনো ব্যক্তি বয়সাধিক্য বশতঃ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মরণোন্মুখ হইয়া থাকিলে লোকে তাহাকে জরাগ্রস্ত বলে কিন্তু যে ব্যক্তির স্ত্রী অপরের আশ্রয়ে অবস্থান করে এবং কদাচারিণী ও কলহ প্রিয়া ও সদা নিন্দনীয় কার্য্যে রত থাকে, আরো লজ্জা সম্ভ্রম ত্যাগ করে, ঐ হতভাগ্য ব্যক্তির পক্ষে বৃদ্ধবয়স হেতু জরা প্রাপ্তির অপেক্ষা করে না—সেইরূপ স্ত্রীই তাহার পক্ষে জরাস্বরূপ; যেহেতু উক্তরূপ নিন্দনীয় কার্য্যেরতা, কুচরিত্রা, অধমা স্ত্রীর স্বামী নিয়ত দুশ্চিন্তায়, নিরানন্দে, বিষাদে, মনোক্ষোভে, নিরুৎসাহে জরাগ্রস্ত হইয়া অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

(১২)

অৰ্দ্ধং ভার্য্যামনুষ্যস্য, ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য, ভার্য্যামূলং তরিষ্যতঃ॥

অর্থাৎ

পত্নীই পুরুষের অর্দ্ধঅঙ্গস্বরূপ অর্থাৎ যে পুরুষ বিবাহ না করিয়াছে তাহাদ্বারা ধর্ম্মকার্য্য ইত্যাদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না বিশেষতঃ "সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ" বলিয়া শাস্ত্রে বিধি দেওয়া হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে বনে নির্ব্বাসিতা করা হেতু, অশ্বমেধ-যজ্ঞ-সম্পাদন-কালে অগত্যা স্বর্ণময়ী সীতা-প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া স্ত্রীর অভাব পূর্ণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আবার ভার্য্যাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতম সখা অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব এমন

কি আত্মজ পুত্র পর্য্যন্তও মনুষ্যের যে পরিমাণ উপকার করিতে পারে কিম্বা অসময়ে যে পরিমাণ সাহায্য প্রদান করিতে পারে, তাহাদের সকলের চেয়ে ভার্য্যাই বেশী উপকারিণী, যেহেতু স্বামীর জন্য স্ত্রী, নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারে, যাহা আর কেহই পারে না। আবার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, যাহা লইয়া মানবের এই গার্হস্থ্য-জীবন-পালন, তাহার মূল হইতেছে স্ত্রী, যেহেতু স্ত্রী, সাহায্যকারিণীরূপে মানবের পার্শ্বে অবস্থিতা না থাকিলে, তাহার পক্ষে ধর্ম্মলাভই বল, ধন উপার্জ্জনই বল, অথবা কামনা নিবৃত্তিই বল, কিছুই পরি-পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। আবার এই সংসারের মায়া-মোহ কাটাইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে হইলে ভার্য্যাই একমাত্র সহায় যেহেতু অধর্ম্মচারিণী স্ত্রীর স্বামী কদাচ ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের সুযোগ সুবিধা পায় না অথবা সে পথে তাহার মতি গতিও হয় না। ইতি।

সমাপ্ত।